مَنْ سَكَتَ نَجَا

"যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়।"

জবানের ক্ষতি

অর্থহীন, অশ্লীল ও অতিরিক্ত কথা, মিথ্যা কথা, হাসি-মজাক, উপহাস, কথায় লৌকিকতা, মিথ্যা শপথ, বিতর্ক, ইত্যাদি বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

মূল

ইমাম গায্যালী (রহঃ)

অনুবাদ

মোহাম্মদ খালেদ

শিক্ষক, মদীনাতুল উলুম মাদ্রাসা

প্রকাশনায়ঃ

মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ *

জিহ্বার ক্ষতির বিবরণ

জিহ্বা আল্লাহ পাকের এক বিরাট নেয়ামত

জিহ্বা আকারে একটি ক্ষুদ্র মাংশপিণ্ড হইলেও ইহা আল্লাহ পাকের এক বিরাট নেয়মত এবং তাঁহার সূক্ষ্ম কারিগরিসমূহের অন্যতম নিদর্শন। মোমেনের ঈমানরূপ শ্রেষ্ঠ নেয়মত এই জিহ্বার মাধ্যমেই প্রকাশ পায় এবং মানুষের চূড়ান্ত বিনাশ ও বরবাদী তথা কুফরীর মত সর্বনাশা পরিণতিও এই জিহ্বার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। অর্থাৎ ঈমান-এবাদত, আনুগত্য ও এতায়াতের ক্ষেত্রে এই জিহ্বার ভূমিকা যেমন ব্যাপক, তদ্রূপ অনাচার-অনাসৃষ্টি ও পাপাচারের ক্ষেত্রেও এই জিহ্বার ভূমিকা সর্বাধিক।

মোটকথা, ভাল-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণ, জ্ঞাত-অজ্ঞাত এবং সৃষ্টি হউক বা স্রষ্টা, বাহ্যিক হউক বা পর্দার অন্তরালে ইত্যাদি প্রতিটি বস্তুই এই জিহ্বায় আসিয়া উচ্চারিত হয়। উদাহরণতঃ মানুষের এলেম ও জ্ঞানের পরিধিতে যাহাকিছু বিদ্যমান, অর্থাৎ– মানুষ যাহাকিছু দেখে, শোনে ও উপলব্ধি করে– চাই তাহা সত্য হউক বা মিথ্যা উহার সকল কিছুই এই জিহ্বার মাধ্যমে উচ্চারিত ও বর্ণিত হয়। জিহ্বার বৈশিষ্ট্য এখানেই। অর্থাৎ– মানব দেহের অপরাপর অঙ্গসমূহ হয়ত বিশেষ কোন অবস্থা ও বস্তুবিশেষকেই উপলব্ধি করিতে পারে; কিন্তু জিহ্বা মানবের উপলব্ধির সকল কিছুই প্রকাশ করিতে পারে। যেমন– চক্ষু কেবল বস্তুসমূহের রং ও আকৃতিকেই উপলব্ধি করিতে পারে, উহার অতিরিক্ত তাহার করিবার কিছুই নাই। কান কেবল আওয়াজ ও শব্দ শুনিতে পায়। হাতের শক্তি কেবল স্পর্শ করা। কিন্তু জিহ্বার শক্তি আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। কল্যাণ ও পুন্যের ক্ষেত্রে ইহা যেমন মানুষকে অন্তহীন সৌভাগ্যের অধিকারী করিতে পারে; তদ্রূপ পাপ-অকল্যাণ ও বরবাদীর ক্ষেত্রেও ইহা

মানুষকে চরম পরিণতি ও ধ্বংসের অতল গহবরে নিক্ষেপ করিতে পারে। এই কারণেই জিহ্বার উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। যেই ব্যক্তি জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারিবে না, শয়তান তাহার মুখ দিয়া কত কি বলাইয়া তাহাকে জাহান্নামের কোথায় নিয়া নিক্ষেপ করিবে উহার কোন ঠিকঠিকানা নাই। হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَ لَا يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ

অর্থ ঃ "জিহ্বার ফসলই মানুষকে উপুড় করিয়া দোজখে নিক্ষেপ করে।"

জিহ্বার ক্ষতি হইতে কেবল তাহারাই বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে যাহারা উহাকে শরীয়তের লাগাম ও সুন্নতের শিকলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং যেই সময় উহা দ্বীন-দুনিয়ার ভালাই ও কল্যাণের কথা বলিবে কেবল তখনই উহাকে মুক্তি দিবে।

কোন্ কথাটি ভাল এবং কোন্‌টি মন্দ, কোন্ ক্ষেত্রে জিহ্বাকে কথা বলার অনুমতি দেওয়া যাইবে এবং কোন্ ক্ষেত্রেই বা উহাকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে হইবে, এই সকল বিষয় সঠিকভাবে চিহ্নিত করা নিতান্তই দুরূহ বটে। তদুপরি এই সকল বিষয়ে অবগতি লাভের পরও উহার উপর আমল করা আরো কঠিন।

মানবের অঙ্গসমূহের মধ্যে জিহ্বাই সর্বাপেক্ষা অবাধ্যতা ও নাফরমানী করিয়া থাকে। কেননা, এই জিহ্বা অতি সহজেই সঞ্চালন করা যায় এবং ইহাতে কিছুমাত্র কষ্ট করিতে হয় না। মানুষ এই জিহ্বার ক্ষতিকে মামুলী মনে করিয়া ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকার ব্যাপারে বড় অবহেলা করিয়া থাকে। অথচ এই জিহ্বার মাধ্যমেই শয়তান মানুষকে বিপথগামী করিয়া থাকে। বক্ষমান বিবরণে আমরা পর্যায়ক্রমে জিহ্বার ক্ষতি, উহার উপকরণ, অনিষ্টের পরিমাণ এবং উহা হইতে আত্মরক্ষার উপায়-উপকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করিব।

জিহ্বার ক্ষতি ও নীরবতার ফজিলত

জিহ্বার ক্ষতির পরিধি ব্যাপক-বিস্তৃত এবং উহার পরিণতিও বড় ভয়াবহ। ইহা হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হইল নীরব থাকা। এই কারণেই শরীয়তে নীরব থাকার প্রশংসা করিয়া উহার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

مَنْ صَمَتَ نَجَا

"যে নীরব থাকে সে মুক্তি পায়।" (তিরমিযী)

অন্য রেওয়ায়েতে আছে–

اَلصَّمْتُ حِكْمَةٌ وَقَلِيْلٌ فَاعِلٌ

অর্থাৎ– "নীরব থাকা হইল হেকমত ও প্রজ্ঞা। (কিন্তু) কম লোকই উহার উপর আমল করে।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সুফিয়ানের পিতা বর্ণনা করেন, একবার আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলাম, ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন কোন কথা বলিয়া দিন যেন আপনার পরে আর কাহারো নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়। আমার এই নিবেদনের জবাবে তিনি এরশাদ করিলেন–

قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ

অর্থাৎ– "বল, আল্লাহর উপর ঈমান আনিলাম। অতঃপর এই ঈমানের উপর কায়েম থাক।"

আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কোন্ বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকিব? জবাবে তিনি জিহ্বার দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, ইহা হইতে বাঁচিয়া থাক। (তিরমিজী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুসলিম)

হযরত ওকবা বিন আমের (রাঃ) বলেন, একবার আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলাম, নাজাতের উপায় কি? তিনি এরশাদ করিলেন,

اَمْسِكْ لِسَانَكَ وَيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ

অর্থঃ "জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ, তোমার ঘর যেন তোমার জন্য যথেষ্ট হয় (অর্থাৎ ঘর হইতে বাহির হইও না) এবং নিজের গোনাহের জন্য (অনুশোচনার) অশ্রু বর্ষণ কর।" (তিরমিজী)

আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আমাকে উভয় কানের মধ্যখানের বস্তু অর্থাৎ জিহ্বা এবং দুই রানের মধ্যস্থানের বস্তু অর্থাৎ লজ্জাস্থানের নিশ্চয়তা দিবে, আমি তাহাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিব। (বোখারী)

অন্য হাদীসে আছে, "যেই ব্যক্তি নিজের উদর, লজ্জাস্থান ও জিহ্বার ক্ষতি হইতে বাঁচিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি সর্বাধিক অনিষ্ট হইতে নিরাপদ থাকে।"

কেননা, মানুষ ব্যাপকভাবে এই তিনটি অঙ্গের খাহেশের কারণেই বিপথগামী হইয়া থাকে।

একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন্ বিষয়ের কারণে মানুষ অধিক পরিমাণে জান্নাতে যাইবে? জবাবে তিনি এরশাদ করিলেন– تقوى الله و حسن الخلق অর্থাৎ "আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্রতার কারণে।" পুনরায় আরজ করা হইল, সেই বিষয়টিও বলিয়া দিন যার কারণে মানুষ জাহান্নামে যাইবে। এরশাদ হইল–

اَلْاَجْوَفَانِ اَلْفَمُ وَ اَلْفَرْجُ

অর্থাৎ– "দুইটি খালি বস্তুর কারণে– মুখ ও লজ্জাস্থান।"

(তিরমিজী, ইবনে মাজা)

এখানে মুখের অর্থ জিহ্বাও হইতে পারে। কেননা, মুখ হইল জিহ্বার আবাস। তাছাড়া মুখের অর্থ পেটও হইতে পারে। কারণ মুখের মাধ্যমে বা মুখের পথ দিয়াই পেট ভরা হয়।

একদা হযরত আব্দুল্লাহ ছাকাফী (রাঃ) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কোন বিষয় বলিয়া দিন যেন সারা জীবন উহার উপর আমল করিতে পারি। তিনি বলিলেন,

قُلْ رَبِّيَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ

অর্থঃ "তুমি বল, আল্লাহ আমার প্রতিপালক। অতঃপর উহার উপর কায়েম থাক।"

ছাহাবী আরজ করিলেন, আপনি আমার সম্পর্কে কোন্ বিষয়টির অধিক আশংকা করিতেছেন? জবাবে তিনি স্বীয় জিহ্বা মোবারক স্পর্শ করিয়া বলিলেনঃ ইহা সম্পর্কে। (নাসাঈ)

হযরত মোয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি? জবাবে তিনি নিজের জিহ্বা মোবারক বাহির করিয়া উহার উপর আঙ্গুল স্থাপন করিলেন, অর্থাৎ নীরব থাকা সর্বোত্তম আমল। (তাবরানী, ইবনে আবিদ্দুনয়া)

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ বান্দার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিক হয়

না, যতক্ষণ তাহার ক্বলব ঠিক না হয়। বান্দার ক্বলব ততক্ষণ ঠিক হয় না, যতক্ষণ তাহার জিহ্বা ঠিক না হয়। আর সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, যার ক্ষতি হইতে তাহার প্রতিবেশী নিরাপদ নহে।

(ইবনে আবিদ্দুন্‌য়া)

এক হাদীছে আছে–

من سره ان يسلم فليلزم الصمت

"যেই ব্যক্তি শান্তি পছন্দ করে, সে যেন নীরবতা অবলম্বন করে।"

(বায়হাকী, ইবনে আবিদ্দুনয়া)

হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেনঃ যখন সকাল হয় তখন মানুষের সকল অঙ্গ জিহ্বাকে বলে, আমাদের বিষয়ে তুমি আল্লাহকে ভয় কর; তুমি ঠিক থাকিলে আমরাও ঠিক থাকিব। আর তুমি বক্র হইলে আমাদের অবস্থাও অনুরূপ হইবে।

(তিরমিজী)

একদা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে নিজের জিহ্বা টানিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাসূলের খলীফা! আপনি ইহা কি করিতেছেন? জবাবে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) বলিলেন, এই জিহ্বাই আমাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছাইয়া দিয়াছে।

আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ দেহের প্রতিটি অঙ্গই আল্লাহ পাকের নিকট জিহ্বার ক্ষিপ্রতা প্রসঙ্গে অভিযোগ করে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি সাফা পাহাড়ে আরোহণ করিয়া তালবিয়া পাঠ করিতেছিলেন এবং নিজের জিহ্বাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন–

يَا لِسَانُ قُلْ خَيْراً تَغْنَمْ وَاسْكُتْ عَنْ شَرٍّ تَسْلِمْ

অর্থঃ "হে জিহ্বা! ভাল কথা বল, লাভবান হইবে এবং অনিষ্ট হইতে নীরব থাক, বিপদমুক্ত থাকিবে।"

লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যাহা বলিতেছেন, ইহাকি আপনার নিজের কথা, না অপর কাহারো নিকট শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিহ্বা সম্পর্কে বলিতে শুনিয়াছি–

ان اكثر خطايا بني آدم في لسانه

"বনী আদমের অধিকাংশ গোনাহ্ হইল তাহার জিহ্বার মধ্যে।"
(তাবরানী, বায়হাকী)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করেন–

مَنْ كَفَّ لِسَانَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَ مَنْ مَلَكَ وَ قَاهُ اللّٰهُ عَذَابَهُ

وَ مَنِ اعْتَذَرَ اِلَى اللّٰهِ قَبِلَ اللّٰهُ عُذْرَهُ

অর্থ ঃ "যেই ব্যক্তি নিজের জিহ্বা সংযত রাখে, আল্লাহ্ পাক তাহার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন। যেই ব্যক্তি ক্রোধ দমন করে, আল্লাহ্ পাক তাহাকে আজাব হইতে রক্ষা করেন। যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের নিকট ওজর করে, আল্লাহ্ পাক তাহার ওজর কবুল করেন।"

একদা হযরত মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু ওসীয়ত করুন। হযরত মোয়াজের নিবেদনের জবাবে আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ তুমি এমনভাবে আল্লাহ্ পাকের এবাদত কর যেন আল্লাহকে দেখিতেছ। নিজের নফ্সকে মৃতদের মধ্যে গণ্য কর। তুমি যদি চাও, তবে আমি তোমাকে এমন বিষয় বলিব যাহা এই সমুদয় বিষয় অপেক্ষা উত্তম; অতঃপর তিনি হাত দ্বারা নিজের জিহ্বার দিকে ইশারা করিলেন। (ইবনে আবিদ্দুন্য়া, তাবরানী)

হযরত সাফওয়ান বিন সলীম (রাঃ) হইতে বর্ণিত, একদা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ আমি কি তোমাদিগকে এমন এবাদতের কথা বলিব না, যাহা খুবই আছান এবং শরীরের জন্যও অত্যন্ত সহজ? (সেই এবাদত হইল) চুপ থাকা এবং উত্তম স্বভাব। (ইবনে আবিদ্দুন্য়া)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ يَسْكُتْ

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি আল্লাহকে এবং পরকালকে বিশ্বাস করে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নীরব থাকে।"

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট নবী করীম ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বানী নকল করা হইয়াছে যে, আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন যে কথা বলিলে উপকারী কথা বলে এবং নীরবতা দ্বারা নিরাপত্তা লাভ করে। (বায়হাকী)

এক ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ)-এর খেদমতে আরজ করিল; আমাকে এমন কোন আমল বলিয়া দিন, যাহা দ্বারা আমি বেহেশত লাভ করিতে পারিব। তিনি বলিলেন, তুমি কখনো কথা বলিও না। লোকটি আরজ করিল, ইহা তো সম্ভব নহে। তিনি বলিলেন, তুমি ভাল কথা ব্যতীত অন্য কিছু বলিও না।

হযরত সুলাইমান (আঃ) বলেন, (মনে কর) কথা বলা যদি রূপা হয়, তবে চুপ থাকা যেন স্বর্ণ।

এক বেদুঈন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আমাকে এমন কোন আমল বলিয়া দিন যাহা দ্বারা আমি জান্নাত লাভ করিতে পারিব। আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ অভুক্তকে আহার করাও, পিপাসার্তকে পানি পান করাও, সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ কর। তুমি যদি এইরূপ করিতে না পার, তবে ভাল কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা বলিও না।

(ইবনে আবিদ্দুনয়া)

এক হাদীসে আছে– নিজের জিহ্বাকে কল্যাণকর কথা ব্যতীত অন্য সকল কথা হইতে বিরত রাখ, ফলে তুমি শয়তানের উপর প্রবল থাকিবে।

(তাবরানী, ইবনে হিব্বান)

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আল্লাহ তায়ালা সকল বক্তার সঙ্গে আছেন। সুতরাং সকলেরই নিজের কথার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। এক রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ মানুষ তিন প্রকার–

১. গনীমত আহরণকারী– যে আল্লাহকে স্মরণ করে।

২. বিপদাপদ হইতে নিরাপদ– যে চুপ থাকে।

৩. ধ্বংসপ্রাপ্ত– যে বাতিলের মধ্যে লিপ্ত।

(তাবরানী, আবু য়া'লা)

মোমেনের জিহ্বা অন্তরের পিছনে। সে কথা বলার পূর্বে চিন্তা করিয়া তবে কথা বলে। পক্ষান্তরে মোনাফেকের জিহ্বা অন্তরের আগে থাকে। সে চিন্তা-ভাবনা করিয়া কথা বলে না। যাহা মনে আসে তাহাই বলে।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেনঃ এবাদতের দশটি অংশের মধ্যে নয়টি নীরব থাকার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং একটি মানুষের সঙ্গ হইতে পৃথক থাকার সহিত।

আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যেই ব্যক্তির কথা বেশী, তাহার অপরাধ বেশী। যেই ব্যক্তির অপরাধ বেশী, তাহার গোনাহ বেশী। আর যেই ব্যক্তির গোনাহ বেশী, সেই ব্যক্তি আজাবের অধিক উপযুক্ত। (আবু নোয়াইম, আবু হাতিম, বায়হাকী)

হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) কথা বলা হইতে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে মুখের ভিতর কংকর পুরিয়া রাখিতেন। তিনি নিজের জিহ্বার দিকে ইশারা করিয়া বলিতেন, ইহা আমার অনেক ক্ষতি করিয়াছে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, ঐ পবিত্র জাতের কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই; মানুষের জিহ্বাই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ সময় কয়েদ রাখার বস্তু।

হযরত তাউস (রহঃ) বলেন, আমার জিহ্বা হইল হিংস্র জন্তু। উহাকে মুক্ত অবস্থায় ছাড়িয়া দিলে সে আমাকে খাইয়া ফেলিবে।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি নিজের জিহ্বাকে হেফাজত করে না, তাহার দ্বীনের সমঝ পরিপক্ক নহে।

হযরত আওজায়ী (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) পত্রযোগে আমাকে লিখিলেন– যেই ব্যক্তি মৃত্যুর কথা বেশী বেশী স্মরণ করে, সে দুনিয়ার অল্প ছামান দ্বারা তুষ্ট হয়। যেই ব্যক্তি কথাকেও আমলের মধ্যে গণ্য করে, সে অর্থহীন কথা বলে না। জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি বলেন, চুপ্ থাকার মাধ্যমে মানুষের দুইটি উপকার হয়। প্রথমতঃ তাহার দ্বীন নিরাপদ থাকে, দ্বিতীয়তঃ অপরের কথা সে ভালভাবে উপলব্ধি করিতে পারে।

একবার মোহাম্মদ বিন ওয়াসে' প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত মালেক বিন দীনারকে বলিলেন, হে আবু ইয়াহ্ইয়া! জিহ্বার হেফাজত টাকা-পয়সার হেফাজত অপেক্ষা উত্তম।

হযরত ইউনুস বিন ওবায়েদ (রহঃ) বলেন, যেই ব্যক্তির জিহ্বা সংযত থাকে, তাহার সকল কাজ ঠিক থাকে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, একবার কয়েক ব্যক্তি হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর দরবারে বসিয়া পরস্পর কথা বলিতেছিল। কিন্তু হযরত আহনাফ বিন কায়েস সেখানে বসিয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিলেন। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)

তাহাকে বলিলেন, হে আবুল বাহার! আপনি কিছু বলিতেছেন না কেন? জবাবে তিনি বলিলেন, যদি মিথ্যা বলি, তবে অন্তরে আল্লাহর ভয় আসে। আর সত্য বলিলে তোমার ভয়ে ভীত হই।

হযরত আবু বকর বিন আয়াস বলেন, একবার পারস্য, রোম, হিন্দুস্তান ও চীন এই চারি দেশের বাদশাহগণ এক বৈঠকে মিলিত হইলেন। এই সময় কথা প্রসঙ্গে এক বাদশাহ বলিলেন, আমি কথা বলিলে লজ্জিত হই, আর কথা না বলিলে আমাকে লজ্জিত হইতে হয় না। দ্বিতীয় জন বলিলেন, আমি যখন কোন কথা বলিয়া ফেলি, তখন সেই কথার নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যাই এবং উহা আর আমার নিয়ন্ত্রণে থাকে না। আর যতক্ষণ সেই কথাটি না বলি, ততক্ষণ উহা আমার নিয়ন্ত্রণে থাকে। তৃতীয় জন বলিলেন, আমি এমন বক্তার কথায় বিস্মিত হই যে, সেই কথাটি যদি তাহার প্রতি ফিরাইয়াও দেওয়া হয় তবুও সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, আর ফিরাইয়া না দিলেও সে উহা দ্বারা লাভবান হইবে না। চতুর্থ জন বলিলেন, যেই কথাটি এখনো বলা হয় নাই, উহা প্রত্যাহার করিতে আমি সক্ষম, কিন্তু একবার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেলে উহা আর প্রত্যাহার করা যায় না।

মনসুর ইবনুল মো'তার দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত এশার নামাজের পর হইতে সকাল পর্যন্ত কোন কথা বলেন নাই। হযরত রবী' বিন খায়সাম দীর্ঘ বিশ বৎসর পর্যন্ত কোন রূপ পার্থিব কথা বলেন নাই। সকালে উঠিয়াই তিনি হাতের কাছে কাগজ কলম রাখিয়া দিতেন এবং কোন কথা বলিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহা লিখিয়া রাখিতেন। সকল কাজ-কর্ম শেষে রাতে হিসাব লইয়া দেখিতেন– কোন্ কথাটি কি কাজে বলা হইয়াছে।

নীরবতা উত্তম হওয়ার কারণ

উপরের আলোচনা পাঠে মনে এইরূপ প্রশ্ন আসিতে পারে যে, এই নীরবতা ও চুপ থাকা উত্তম হওয়ার কারণ কি? উহার জবাব হইল, কথা বলিতে গেলেই পদে পদে যত বিপদাশংকা। ঝুট, মিথ্যা, পরনিন্দা, গীবত-শেকায়েত, রিয়া চোগলখোরী, কথা বাড়াইয়া বলা বা হ্রাস করা, মিথ্যা প্রশংসা, আত্মপ্রশংসা, অপরকে কষ্ট দেওয়া, গোপন বিষয় ফাঁস করিয়া দেওয়া ইত্যাদি সর্বনাশা অপরাধসমূহ এই জিহ্বার মাধ্যমেই হইয়া থাকে। জিহ্বা অতি সহজেই সঞ্চালন করা যায় এবং উহাতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। বরং কথা বলায় অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ অনর্গল কথা বলিতে এক প্রকার আত্মসুখই অনুভব করিয়া থাকে।

বস্তুতঃ যাহারা অতিশয় কথা বলায় অভ্যস্ত তাহাদের পক্ষে কোন্ কথা বলা উচিত আর কোন্ কথা বলা উচিৎ নহে এই সকল বিষয় জানিয়া তদনুযায়ী নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় না। বরং এই শ্রেণীর লোকেরা পরিণাম চিন্তা না করিয়া অনর্গল সব ধরনের কথাই বলিতে থাকে। তা ছাড়া কোন্ কথাটি মন্দ আর কোন্ কথাটি ভাল, তাহা কেবল আলেমগণের পক্ষেই অবগত হওয়া সম্ভব।

মোটকথা, কথা বলার মধ্যেই যত বিপদের আশংকা এবং চুপ থাকার মধ্যেই নিরাপত্তা। এই কারণেই কথা বলা অপেক্ষা চুপ থাকার ফজিলত অধিক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। নীরব থাকার আরো অনেক ফায়দা রহিয়াছে। যেমন কম কথা বলা ও নীরবতার ফলে হিম্মত, সাহস ও ভাব-গাম্ভীর্য সুসংহত থাকে এবং জিকির-ফিকির ও এবাদতের সুযোগ পাওয়া যায়। তাছাড়া চুপ থাকার ফলে দুনিয়াতে কথা বলার বিপদ এবং পরকালে উহার হিসাব হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

অর্থঃ "সে যেই কথাই উচ্চারণ করে, তাহাই গ্রহণ করার জন্য তাহার নিকট সদাপ্রস্তুত প্রহরী রহিয়াছে।" (সূরা ক্বাফ - ১৮ আয়াত)

এক্ষণে আমরা যুক্তি-প্রমাণাদিসহ চুপ থাকার ফজিলত এবং উহার উপকারিতা উল্লেখ করিব। চুপ থাকার উপকারিতা, কথা বলার অনিষ্টের বিবেচনায় 'কথা' মোট চারি প্রকার–

(এক) এমন কথা যাহার মধ্যে কেবল অকল্যাণ ও ক্ষতিই নিহিত।

(দুই) যেই কথা সর্ব বিবেচনায় মানুষের জন্য কল্যাণকর ও উপকারী।

(তিন) যেই কথার মধ্যে অপকার ও উপকার উভয়ই নিহিত।

(চার) যেই কথার মধ্যে কোন ক্ষতিও নাই এবং উপকারও নাই।

প্রথম প্রকারে বর্ণিত কথার ক্ষেত্রে নীরব থাকা আবশ্যক। তৃতীয় প্রকারের কথার ক্ষেত্রে যদি উপকারের তুলনায় ক্ষতি বেশী হয় তবে সেই ক্ষেত্রেও নীরব থাকিতে হইবে। চতুর্থ প্রকার কথা কেবল অকারণে সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নহে। এখন অবশিষ্ট রহিল কেবল দ্বিতীয় প্রকারের কথা এবং ইহাই কেবল বলার যোগ্য কথা। সুতরাং দেখা যাইতেছে– কথার সমষ্টির কেবল এক চতুর্থাংশই বলার যোগ্য এবং উহার তিন চতুর্থাংশ বর্জনীয়। দ্বিতীয় প্রকারে বর্ণিত যাহা বলার যোগ্য সেই ক্ষেত্রেও পদে পদেই বিপদের আশংকা রহিয়াছে।

কেননা, এই কথা বলার ক্ষেত্রেও মানুষের অবচেতন মনে এমন কিছু গর্হিত উপসর্গ আসিয়া উহার সহিত যুক্ত হয় যে, অনেক সময় মানুষ উহার উপস্থিতি টেরও পায় না। যেমন– রিয়া, গীবত-শেকায়েত, পরনিন্দা, আত্মপ্রীতি ইত্যাদি বিষয় সমূহ অতি সূক্ষ্মভাবেই মানুষের ভাল কথার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া উহাকেও মন্দ ও গর্হিত কথায় পরিণত করিয়া ফেলে। সুতরাং কথা বলার অর্থই যেন বিপদ লইয়া খেলা করা।

তো যেই ব্যক্তি উপস্থাপিত বিবরণের আলোকে কথা বলার সূক্ষ্ম বিপদ, উহার অনিষ্ট ও পরিণতি সম্পর্কে বিশদভাবে পরিজ্ঞাত হইবে, সেই ব্যক্তি ইহাও নিশ্চিতভাবেই উপলব্ধি করিবে যে, এই প্রসঙ্গে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তিই চূড়ান্ত ও যথার্থ। তিনি এরশাদ করিয়াছেন–

مَنْ سَكَتَ نَجَا

"যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়।"

বস্তুতঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এলেম, হেকমত ও প্রজ্ঞা-সমুদ্রের সিঞ্চিত মণিমুক্তার আধার। তাঁহার পবিত্র জবান-নিসৃত প্রতিটি কথাই ছিল পরিপূর্ণ হেকমত, প্রজ্ঞা ও তাৎপর্যের নূরানী আবরনে আচ্ছাদিত। এই আবরণ উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার পবিত্র বাণীর তাৎপর্য অনুধাবন করা– ইহা সকলের কাজ নহে। কেবল মোহাক্কেক আলেমগণের পক্ষেই ইহা সম্ভব। বক্ষমান আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা পর্যায়ক্রমে মানুষের মুখ-নিসৃত কথার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনিষ্ট ও বিপদ সমূহের ধারাবাহিক বিবরণ উল্লেখ করিব।

অর্থহীন কথা

মানুষের কর্তব্য হইল নিজের মুখ হইতে কেবল এমন কথাই উচ্চারণ করা যাহা উপকারী ও কল্যাণকর এবং এমন সব কথা হইতে বিরত থাকা যাহা ক্ষতিকর। মিথ্যা, পরনিন্দা, গীবত-শেকায়েত, চোগলখোরী ইত্যাদি অনিষ্টকর কথা হইতে অবশ্যই নিজেকে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

যেই কথা না বলিলে কোন গোনাহ হয় না এবং যাহা না বলা নিজের জান-মালের জন্যও ক্ষতিকর নহে উহাই অর্থহীন কথা। মানুষের জন্য সব চাইতে নিরাপদ অবস্থা হইল কোন কথা বলার সময় ভালভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবে যেন কোন অবস্থাতেই তাহা উপরে বর্ণিত গীবত-শেকায়েত ইত্যাদি অনিষ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া না পড়ে। কেবল এমন কথাই বলিবে যাহা শরীয়ত সম্মত এবং যাহা নিজের জন্য বা অন্য কোন মুসলমানের জন্য ক্ষতিকর নহে।

অবশ্য অনেক সময় মানুষের মুখ হইতে অর্থহীন ও অনাবশ্যক কথাও বাহির হইয়া যায় বটে। উহার ফলে এক দিকে যেমন সময় অপচয় হয়, অপর দিকে পরকালের হিসাব বৃদ্ধি পায় এবং নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে উৎকৃষ্ট বস্তু হাত ছাড়া হয়। কেননা, বক্তা যদি তাহার কথার পরিবর্তে নীরবে আল্লাহ পাকের জাত-সিফাত ও গুণ-বৈশিষ্টের ফিকিরে নিমগ্ন থাকিত, তবে অবশ্যই উহা তাহার জন্য অধিক লাভজনক হইত এবং উহার কারণে তাহার প্রতি আল্লাহর রহমতের দরজা খুলিয়া যাওয়াও অসম্ভব ছিল না। আর আল্লাহ পাকের জাত-সিফাত ও কুদরতের উপর চিন্তা ও গবেষণার ফলে অদৃশ্য জগতের রহস্যাবলী উন্মোচিত হইয়া যাওয়াও খুবই সম্ভব।

মানুষ অর্থহীন কথা না বলিয়া যদি আল্লাহ পাকের তাসবীহ তাহলীল ও জিকির-আজকারে লিপ্ত থাকে, তবে অবশ্যই উহা তাহার জন্য অধিক উপকারী ও লাভজনক হইবে। যেই ব্যক্তি মণি-মুক্তা লাভ করিতে সক্ষম, সেই ব্যক্তি যদি ইট-পাথর ও কংকর সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে ইহা তাহার দুর্ভাগ্য ও বোকামীই বলিতে হইবে। অর্থাৎ বৈধ ও মোবাহ কথা বলা যদিও গোনাহ নহে কিন্তু যেই সময়টুকু কথা বলা হইল সেই সময়টুকু যদি আল্লাহ পাকের জিকির করা হইত তবে বিপুল পরিমাণ ছাওয়াবের অধিকারী হওয়া যাইত; এই ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হওয়া– ইহাও কম ক্ষতি নহে।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

فان المؤمن لا يكون صمته الا فكرا و نظره الا عبرة و نطقه الا ذكرا .

অর্থাৎ, "মোমেনের নীরবতা হইল ফিকির, তাহার দৃষ্টি এবাদত এবং তাহার কথা আল্লাহর জিকির।"

মানুষের সবচাইতে বড় সম্পদ হইল সময়। সুতরাং মানুষ যদি এই মূল্যবান সময়কে অর্থহীন ক্রিয়া-কর্ম হইতে বাঁচাইয়া পরকালের কাজে ব্যয় না করে, তবে ইহা তাহার জন্য নিতান্ত দুর্ভাগ্যেরই কারণ হইবে। এই কারণেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه

অর্থাৎ, "মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হইল, অর্থহীন বিষয় বর্জন করা।"

(তিরমিজী, ইবনে মাজা)

এক হাদীসে তো উপরোক্ত বিষয়টি আরো কঠোর ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ওহোদের যুদ্ধে এক যুবক শহীদ হওয়ার পর আমরা দেখিতে পাইলাম, তাহার পেটে পাথর বাঁধা আছে। ক্ষুধার কারণেই সে পেটে পাথর বাঁধিয়াছিল। এই সময় যুবকের মাতা তাহার চেহারা হইতে ধুলাবালি মুছিয়া দিতে দিতে বলিল, "বেটা! জান্নাত মোবারক হউক।" এই কথা শুনিয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কিরূপে জানা গেল যে, সে জান্নাতী হইবে? এমনও তো হইতে পারে যে, সে অনর্থক কথা বলিত।

একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রমাগত কয়েকদিন হযরত কায়াব (রাঃ)-কে না দেখিয়া ছাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কায়াব কোথায়? তাহারা আরজ করিলেন, কায়াব অসুস্থ। অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হযরত কায়াবকে দেখিতে গেলেন এবং তাহার নিকটে গিয়া বলিলেনঃ ابشر يا كعب। "হে কায়াব! তোমার জন্য সুসংবাদ।"

হযরত কায়াবের মাতা আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবান হইতে এই সুসংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং ছেলেকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে কায়াব! তোমার বিনা হিসাব জান্নাত মোবারক হউক। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই মহিলা কে, যে আল্লাহর উপর হুকুম জারী করে? হযরত কায়াব (রাঃ) আরজ করিলেন, ইনি আমার মাতা। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে কায়াবের মাতা! তুমি কেমন করিয়া জানিলে? তোমার ছেলে হয়ত কখনো অনর্থক কথা বলিয়া থাকিবে।

উপরোক্ত হাদীসের তাৎপর্য হইল, যেই ব্যক্তির জিম্মায় কোন হিসাব নাই, সেই ব্যক্তির পক্ষেই বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু যেই ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন অনাবশ্যক কথা বলিয়াছে, পরকালে তাহাকে উহার হিসাব দিতে হইবে– যদিও সেই কথা মোবাহ হয়। সুতরাং এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার উক্তি করা ঠিক নহে। আখেরাতের কঠিন দিবসে কোন বিষয়ের হিসাব দেওয়া ইহাও এক প্রকার আজাব বটে। এই প্রাথমিক আজাব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার পরই জান্নাতে যাওয়া যাইবে।

হযরত মোহাম্মদ বিন কায়াব (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ আজ যেই ব্যক্তি সর্ব প্রথম এই দরজা

দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে, সে জান্নাতে যাইবে। পরে দেখা গেল, সেই দরজা দিয়া সর্ব প্রথম হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম ভিতরে প্রবেশ করিলেন। উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম হযরত আব্দুল্লাহ সম্পর্কে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি তাহাকে অবহিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সেই মজবুত আমল কোন্‌টি যেই আমলের কারণে আপনি বেহেশতে যাওয়ার আশা করিতেছেন? জবাবে হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম বলিলেন, আমি একজন দুর্বল মানুষ, আমার দ্বারা মজবুত আমল হইবে কিরূপে? তবে এই কারণে আমি আশাবাদী যে, আমি আমার সীনাকে হেফাজত করি এবং কোন অপ্রয়োজনীয় কথা বলা হইতে বিরত থাকি। (ইবনে আবিদ্দুন্‌য়া)

হযরত আবু জর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ আমি কি তোমাকে এমন আমলের কথা বলিব না, যাহা শরীরের জন্য খুবই হালকা এবং মিজানে খুব ভারী হইবে? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অবশ্যই তাহা বলুন। তিনি এরশাদ করিলেনঃ সেই আমল হইল নীরবতা, উত্তম চরিত্র এবং অপ্রয়োজনীয় (কথা ও কাজ) বর্জন করা। (ইবনে আবিদ্দুনয়া)

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে শুনিয়াছি, তিনি বলিতেন— পাঁচটি বিষয় আমার নিকট ওয়াক্‌ফকৃত দেরহাম অপেক্ষাও উত্তম মনে হয়। সেই পাঁচটি বিষয় হইল—

(এক) অর্থহীন কথা না বলা। কেননা, এই অনাবশ্যক ও অতিরিক্ত কথা দ্বারা গোনাহ হওয়ার আশংকা বিদ্যমান থাকে।

(দুই) উপকারী কথাও মওকা ও সুযোগ বুঝিয়া বলা। কারণ, অনেক সময় ভাল কথাও যদি বে-মওকা বলা হয়, তবে উহা অনিষ্ট ও কষ্টের কারণ হইয়া থাকে।

(তিন) সহনশীল ও আহাম্মক এই দুই শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে কোন বিষয়ে বিতর্ক না করা। কেননা, সহনশীল মানুষের সঙ্গে তর্ক করার অর্থ হইল তাহাকে উত্তেজিত করা। আর আহাম্মকের সঙ্গে তর্ক করার অর্থ নিজে কষ্ট পাওয়া।

(চার) নিজের কোন অনুপস্থিত ভাই প্রসঙ্গে কেবল এমন আলোচনাই করা, যেই ভাবে সে নিজের আলোচনা নিজে করিতে পছন্দ করে। তাহার সেই সকল দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দেওয়া যাহা সে নিজে ক্ষমা করাইতে পছন্দ করে। তাহার সঙ্গে এমন আচরণ করা যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

(পাঁচ) যাবতীয় আমল এমন একীনের সঙ্গে করা যে, আমার এই আমল যদি ভাল হয়, তবে উহার বিনিময় পাওয়া যাইবে। আর আমার এই আমল খারাপ হইলে উহার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

হযরত আজালী (রহঃ) বলেন, আমি দীর্ঘ বিশ বৎসর যাবৎ একটি বিষয় সন্ধান করিয়া ফিরিতেছি কিন্তু এখনো সেই বিষয়টি হাসিল করিতে পারি নাই। এতদ্ সত্ত্বেও উহার সন্ধান পরিত্যাগ করি নাই। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, সেই বিষয়টি কি? তিনি বলিলেন, যাহা উপকারী নহে এমন কথা হইতে নীরবতা অবলম্বন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন, তোমরা অর্থহীন কথায় প্রবৃত্ত হইও না। নিজের শত্রু হইতে দূরে থাক এবং বন্ধুকে এড়াইয়া চলিও। অবশ্য বন্ধু যদি আমীন হয় তবে ভিন্ন কথা। আমীন সেই ব্যক্তিই হইতে পারে যাহার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে। কখনো কোন পাপী লোকের সংস্রবে বসিও না। কেননা, উহার ফলে তোমরাও তাহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পড়িবে। তাহার নিকট কখনো নিজের একান্ত গোপন কথা প্রকাশ করিও না। নিজের কোন কাজের বিষয়ে এমন লোকদের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিও যাহারা আল্লাহকে ভয় করে।

অর্থহীন কথার সংজ্ঞা

এক্ষণে আমরা অর্থহীন কথার সংজ্ঞা এবং উহার পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করিব। এমন কথাকেই অর্থহীন কথা বলা হয় যে, তুমি যদি সেই কথা না বলিয়া নীরব থাক, তবে তোমার কোন গোনাহ হইবে না এবং উহার ফলে উপস্থিত ক্ষেত্রে কিংবা পরবর্তীতেও কোনরূপ ক্ষতির শিকার হইতে হইবে না। উহার-উদাহরণ এইরূপ- মনে কর, তুমি কোন মজলিসে বসিয়া সকলকে তোমার সফরের ঘটনা শোনাইতেছ যে, তুমি কত বিরাট বিরাট পাহাড়-পর্বত এবং প্রবাহমান নহর ইত্যাদি দেখিয়াছ। সফরে কেমন কেমন বিস্ময়কর ও মনোরম দৃশ্যাবলী দেখিয়াছ এবং কত রকমারী খাবার খাইয়াছ। কত মহান ও বুজুর্গ ব্যক্তিগণের সঙ্গে তোমার সাক্ষাত হইয়াছে ইত্যাদি।

এইসব আলোচনা এমন যে, উহা বর্ণনা না করিলেও তোমার কোন গোনাহ হইত না এবং উহার কারণে তোমার কোন ক্ষতিও হইত না। আর এই ক্ষতি না হওয়ার অবস্থাটিও কেবল সেই ক্ষেত্রে যে, ঘটনা যেইভাবে ঘটিয়াছে এবং তুমি যাহা যাহা দেখিয়াছ হুবহু সেইভাবেই যদি তাহা বর্ণনা করিয়া থাক এবং উহাতে

কিছুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া না থাক। তোমার বিবরণে কাহারো সমালোচনা, গীবত-শেকায়েত, নিজের অহংকার-বড়াই ইত্যাদি কিছুই যদি প্রকাশ করা না হয়।

তো এতসব এহ্তিয়াত ও সতর্কতা অবলম্বনের পরও এই প্রসঙ্গে তোমাকে ইহাই বলা হইবে যে, সফরের ঘটনা বর্ণনা করিয়া তুমি সময়ের অপচয় করিয়াছ। তদুপরি এই আশংকা তো সততই বিদ্যমান যে, ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে তুমি যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিয়াছ, না এই ক্ষেত্রে তোমার জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বা অবচেতন মনে কোন গর্হিত অবস্থার শিকার হইয়াছ।

কাহাকেও কোন গর্হিত প্রশ্ন করার ক্ষেত্রেও এই একই কথা। অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রশ্নকারী ও শ্রোতা উভয়েরই সময় নষ্ট হয়। বরং তুলনামূলকভাবে প্রশ্নকারীরই ক্ষতির আশংকা বেশী। কেননা, প্রশ্ন করিয়া তুমি উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে উহার জবাব দানে বাধ্য করিলে এবং তাহার সময়ও নষ্ট করিলে। ইহাও কেবল সেই ক্ষেত্রে, যখন প্রশ্ন করার মধ্যে কোনরূপ অনিষ্টের সংমিশ্রণ না থাকে। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশ্ন করার মধ্যে কোন না কোন অনিষ্ট ও বিপদ লুকাইয়া থাকে। উহার উদাহরণ এইরূপঃ মনে কর, তুমি রোজাদারকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে রোজা রাখিয়াছে কি না। এখন এই প্রশ্নের জবাবে সে যদি হাঁ বলে, তবে বলা হইবে যে, এই জবাবের মাধ্যমে সে নিজের এবাদতের কথা প্রকাশ করিয়াছে। অর্থাৎ নিজের এবাদতের কথা অপরের নিকট জাহির করার ফলে সর্বনাশা রিয়ার শিকার হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। যদি রিয়ার শিকার নাও হয়, তবুও এই জবাবের ফলে তাহার "গোপন এবাদত" প্রকাশ্য এবাদতের মধ্যে পরিবর্তিত হইয়া এবাদত গোপন রাখার ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে।

পক্ষান্তরে রোজাদার যদি সেই প্রশ্নের জবাবে 'না' বলে, তবে ইহা মিথ্যা হইবে। আর জবাব না দিয়া যদি নীরব থাকে, তবে প্রশ্নকর্তাকে অপমান করা হইবে এবং উহার ফলে সে মনে কষ্ট পাইবে। অনুরূপভাবে কোন প্রকার হিলা-বাহানা ও কৌশল অবলম্বন করিয়া যদি সেই প্রশ্নের জবাব এড়াইয়া যাওয়া হয়, তবে এই ক্ষেত্রে অকারণেই প্রশ্নকর্তা মানসিক পীড়ন ও বিব্রতকর অবস্থার শিকার হইবে। অর্থাৎ এইভাবে একটি অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের মাধ্যমে রিয়া, মিথ্যা, মুসলমানকে হেয় করন এবং মানসিক পীড়ন ইত্যাদি চারি প্রকার অনিষ্টের যে কোন একটির শিকার হইতে হইবে।

অনুরূপভাবে কোন গোনাহের বিষয়ে এবং এমন কোন গোপন বিষয়েও প্রশ্ন

করা ঠিক নহে, যার উত্তর দিতে মানুষ লজ্জাবোধ করে। কাহাকেও এইরূপ প্রশ্ন করাও ঠিক নহে যে, অমুক ব্যক্তি তোমাকে কি বলিয়াছে কিংবা অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? কোন মুসাফিরকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা ঠিক নহে যে, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ। কেননা, অনেক সময় নিজের মহল্লা ও গ্রামের নাম সঙ্গত কারণেই গোপন রাখিতে হয়। সুতরাং এই প্রশ্নের জবাবে যদি সত্য বলা হয় তবে গোপনীয়তা ভঙ্গ হইয়া যায় কিংবা গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া মিথ্যা বলিতে হয়।

অনুরূপভাবে কোন আলেমকে অকারণে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করিবে না। কেননা, অনেক সময় যাহাকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয়, সে উহার জবাব দিতে না পারিলে প্রশ্নকারীর সম্মুখে অপমানবোধ করে এবং এই অপমান এড়াইবার উদ্দেশ্যে হয়ত মাসআলা জানা না থাকা সত্ত্বেও মনগড়া কোন জবাব দিয়া নিজেও গোমরাহ হয় এবং প্রশ্নকর্তাকেও বিপথগামী করে।

এখানে যেইসব প্রশ্নের কথা বলা হইল এই ধরনের প্রশ্নকে অর্থহীন কথার মধ্যে গণ্য করা হইবে না। কেননা, ইতিপূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, "অর্থহীন কথা" হইল যাহা না বলিলে কোন গোনাহ হয় না এবং কোনরূপ ক্ষতিরও শিকার হইতে হয় না। কিন্তু এখানে যেইসব প্রশ্নের অবতারণা করা হইল, উহাতে গোনাহ ও ক্ষতি বিদ্যমান। "অর্থহীন কথা" কাহাকে বলা হয় নিম্নের উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়ে আরো স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাইবে–

একবার হযরত লোকমান হেকিম (রহঃ) হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট গিয়া দেখিতে পাইলেন, তিনি একটি লৌহবর্ম বানাইতেছেন। হযরত লোকমান হেকিম ইতিপূর্বে আর কখনো লৌহবর্ম দেখেন নাই। এই কারণে উহা দেখিয়া তিনি যারপরনাই বিস্মিত হইলেন এবং হযরত দাউদ (আঃ)-কে উহা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হেকমত ও প্রজ্ঞা তাহাকে বাধা দিল এবং তিনি নীরব রহিলেন। কিছু সময় পর হযরত দাউদ (আঃ) বর্ম নির্মাণ শেষে উহা পরিধান করিয়া বলিলেন, যুদ্ধের জন্য লৌহবর্ম বড় উপকারী পোশাক। এইবার হযরত লোকমান হেকিম লৌহবর্মের পরিচয় পাইয়া মনে মনে বলিলেন, "নীরবতাই বড় হেকমত"।

তো এইসব বিষয় উপলব্ধি করা এবং উপলব্ধি করিবার পর উহার উপর আমল করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। হযরত লোকমান হেকিম যদি বর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেন তবে এই প্রশ্নের কারণে তাহার কোন গোনাহ হইত না এবং তিনি কোনরূপ ক্ষতিরও শিকার হইতেন না। কিন্তু তাহার হেকমত ও

প্রজ্ঞার কারণেই তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, এই প্রশ্নটি অর্থহীন কথার মধ্যে গণ্য হইবে এবং এই কারণেই তিনি নীরব ছিলেন। এই উদাহরণে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, হযরত লোকমান হেকিম সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে কোন প্রশ্ন না করিয়াই উহা সম্পর্কে এলেম হাসিল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মোটকথা, যেই সকল প্রশ্নের মধ্যে কোনরূপ অনিষ্ট, অতিরঞ্জন, রিয়া, মিথ্যা, অপরকে হেয় করা ইত্যাদি বিদ্যমান নহে উহা অর্থহীন কথার মধ্যে গণ্য এবং হাদীসের বর্ণনামতে উহা বর্জন করা ইসলামের সৌন্দর্য।

অর্থহীন কথার উপকরণ

অর্থহীন কথা মোটামুটি কয়েক প্রকার ভিত্তির উপর বলা হয়। অনেক সময় উহার কারণ হয় বক্তার অপ্রয়োজনীয় কথা বলার লোভ, আবার অনেক সময় কথা প্রচার করিয়া বেড়ানোর অভ্যাসের কারণেও তাহা বলা হয় কিংবা বক্তা হয়ত দীর্ঘ সময় কথা বলিয়া শ্রোতাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চাহে। আবার অনেক সময় হয়ত শ্রোতার প্রতি মোহাব্বত ও ভালবাসার কারণেও দীর্ঘ সময় কথা বলিয়া তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে মন চাহে। আবার কোন কোন সময় হয়ত আত্মতৃপ্তি ও বিনোদনের জন্যও কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করা হয়।

এইসব ব্যাধির এলাজ ও চিকিৎসা হইল– সর্বদা মৃত্যুকে উপস্থিত জ্ঞান করিয়া এইরূপ করিবে যে, দুনিয়াতে আমি যাহা যাহা বলিতেছি, মৃত্যুর পর উহার প্রতিটি শব্দের হিসাব দিতে হইবে। আমার শ্বাস হইল শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং আমার জিহ্বা এমন জাল যাহা দ্বারা বেহেশতের হুর ধরা যাইবে। সুতরাং নিজের আসল সম্পদ নষ্ট করা আর এমন মূল্যবান জালটি বেকার পড়িয়া থাকিতে দেওয়া কোন বুদ্ধিমানের কাজ নহে।

এই হইল, অর্থহীন কথা বলার দুষ্ট ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষার এলমী চিকিৎসা। উহার আমলী চিকিৎসা হইল– নির্জনতা অবলম্বন কিংবা মুখে কংকর পুরিয়া রাখা, যেন কথা বর্জনে বাধ্য হইতে হয়। অথবা মাঝে মধ্যে উত্তম কথাও বর্জন করিবে যেন অপ্রয়োজনীয় কথা পরিত্যাগের অভ্যাস গড়িয়া ওঠে। অবশ্য যেই ব্যক্তি নির্জনতার পরিবর্তে সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকা পছন্দ করে, তাহার পক্ষে জিহ্বাকে সংযত রাখা কঠিন বটে।

অধিক কথা বলা

অধিক কথা বলা সর্বাবস্থায় নিন্দনীয়। অনর্থক এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথাও ইহার মধ্যে গণ্য। প্রয়োজনীয় কথা যেই ক্ষেত্রে সংক্ষেপেও হইতে পারে সেই ক্ষেত্রে একটি বাক্যের স্থলে যদি দুইটি বাক্য ব্যবহার করা হয়, তবে দ্বিতীয় বাক্যটি অতিরিক্ত হইবে। কোন গোনাহ ও ক্ষতি না হইলেও এই অতিরিক্ত কথন নিষিদ্ধ।

হযরত আতা বিন রাবাহ (রহঃ) বলেন, আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ অনর্থক কথা বলা পছন্দ করিতেন না। তাহাদের নিকট আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ এবং অত্যাবশ্যকীয় কথা ব্যতীত অন্য সকল কথাই অতিরিক্ত কথার মধ্যে গণ্য ছিল। বস্তুতঃ এই কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, প্রতিটি মানুষেরই ডানে-বামে কিরামান কাতেবীন সদা সতর্ক অবস্থায় মানুষের ভাল-মন্দ সকল আমল লিপিবদ্ধ করিতেছে। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

অর্থ ঃ "সে যেই কথাই উচ্চারণ করে, তাহাই গ্রহণ করার জন্য তাহার নিকট সদা প্রস্তুত প্রহরী রহিয়াছে।" (সূরা ক্বাফ - ১৮ আয়াত)

তোমরা কি এই বিষয়ে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ কর না যে, হাশরের ময়দানে যখন তোমাদের আমলনামা খোলা হইবে, তখন উহাতে এমন অসংখ্য আমলের উল্লেখ পাওয়া যাইবে, যেই সকল আমলের সঙ্গে না দ্বীনের, না দুনিয়ার কোন সম্পর্ক আছে?

এক ছাহাবী বলেন, লোকেরা আমার নিকট যেইসব প্রশ্ন করে, সেইসব প্রশ্ন তাহাদের নিকট এমন ভাল লাগে যেমন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির নিকট ঠাণ্ডা পানি ভাল লাগে। আর আমার নিকটও তাহাদের প্রশ্নের জবাব দিতে অনুরূপ ভাল লাগে। কিন্তু আমি এই ভয়ে নীরব থাকি যে, আমার এই কথা আবার অতিরিক্ত কথার মধ্যে গণ্য না হয়।

হযরত মুতরিফ বলেন, তোমরা আল্লাহ পাকের শান ও প্রতাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। এমন কোন স্থানে তাঁহার উল্লেখ করিও না, যেখানে তাঁহার শান ক্ষুণ্ন হওয়ার বিন্দুমাত্র সন্দেহও হইতে পারে। যেমন কুকুর বা গাধা দেখিয়া এইরূপ বলিও না যে, হে আল্লাহ! ইহাকে দূরে সরাইয়া দাও।

অতিরিক্ত কথার সীমা

কোন্ কথাটি অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় তাহা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন। কেননা, উহার কোন সীমা-পরিসীমা নাই। অবশ্য পবিত্র কোরআনে প্রয়োজনীয় ও জরুরী কথার সীমা বর্ণিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে–

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

অর্থঃ "তাহাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নহে; কিন্তু যেই সলা-পরামর্শ দান-খয়রাত করিতে কিংবা সৎ কাজ করিতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কল্পে করিত তাহা স্বতন্ত্র।"

সরওয়ারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ "সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে নিজের জিহ্বাকে অতিরিক্ত কথা হইতে সংযত রাখে এবং অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিয়া দেয়।"

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হইল, আজকাল মানুষ হাদীসের এই বাণীর বিপরীতে অবস্থান লইয়াছে। তাহারা অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং জিহ্বাকে বল্গাহীনভাবে ছাড়িয়া দেয়।

হযরত মুতরিফের পিতা বর্ণনা করেন, একদা তিনি আমের গোত্রের লোকদের সঙ্গে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হন। এই সময় লোকেরা পেয়ারা নবীর খেদমতে আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদের মনিব, আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং দয়ালু। আপনি এইরূপ, এইরূপ ইত্যাদি। তাহাদের এইসব মন্তব্যের জবাবে তিনি ফরমাইলেন–

قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ لَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ

অর্থঃ "তোমরা নিজেদের কথা (অবশ্যই) বল (কিন্তু এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিও যেন) শয়তান তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে না পারে।"

(ইবনে আবিদ্দুনয়া, আবু দাউ, নাসাঈ)

অর্থাৎ– মানুষ যখন কাহারো প্রশংসা করে, তখন যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করার পরও কেমন্ করিয়া যে উহাতে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি আসিয়া যুক্ত হয়, তাহা টেরও পাওয়া যায় না। আর সত্য প্রশংসার ক্ষেত্রেও শয়তান মানুষের মুখ দিয়া অতিরিক্ত কোন শব্দ বাহির করিয়া দিবার আশংকা তো লাগিয়াই থাকে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি তোমাদিগকে অতিরিক্ত কথার ব্যাপারে সতর্ক করিতেছি। কথা এই পরিমাণই বলা উচিত যাহা দ্বারা প্রয়োজন মিটিয়া যায়।

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, মানুষের মুখ-নিসৃত প্রতিটি শব্দই লিখিয়া রাখা হয়। এমনকি শিশুকে চুপ করানোর জন্য যদি বলা হয়– "তোমাকে অমুক বস্তু আনিয়া দিব" আর প্রকৃতপক্ষে যদি তাহা আনিয়া দেওয়ার নিয়ত না থাকে, তবে তাহাকে মিথ্যাবাদী লেখা হইবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, হে লোকসকল! তোমাদের আমলনামা খোলা আছে এবং দুইজন ফেরেশতা তোমাদের আমল লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত আছেন। এখন তোমাদের নিজেদের উপরই সব নির্ভর করে; তোমরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার। ইচ্ছা হয় কম কথা বল, না হয় বেশী বল। রোজ কেয়ামতে এই আমলনামা তোমাদের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে দলীল হইবে।

বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত সোলাইমান আলাইহিস্ সালাম এক জ্বীনকে কোথাও পাঠাইলেন। অতঃপর তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য আরো কয়েক জন জ্বীন তাহার পিছনে পাঠাইলেন। তাহারা দেখিতে পাইল্– সেই জ্বীন এক বাজারে গিয়া প্রথমে আকাশের দিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া কি যেন তাকাইয়া দেখিল এবং পরক্ষণেই মস্তক নিম্নমুখী করতঃ মানুষের দিকে তাকাইয়া মাথা দুলাইল। অতঃপর সে সামনের দিকে আগাইয়া গেল। হযরত সোলাইমান (আঃ) পর্যবেক্ষক জ্বীনদের মাধ্যমে এই ঘটনা শুনিয়া বড় বিস্মিত হইলেন। পরে তিনি সেই জ্বীনকে ডাকাইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আকাশের ফেরেশতাদের কর্মতৎপরতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম যে, তাহারা মানুষের মাথার উপর বসিয়া কত দ্রুত তাহাদের আমলনামা লিপিবদ্ধ করিতেছে। আর মানুষের অবস্থা দেখিয়াও আমি অবাক হইলাম যে, তাহারা কত দ্রুত বিপথগামী হইতেছে।

হযরত ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন, মোমেন ব্যক্তি কথা বলার পূর্বে চিন্তা করিয়া দেখে যে, এই কথা তাহার জন্য উপকারী, না ক্ষতিকর হইবে। যদি উপকারী হইবে বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তবে কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে। আর পাপী লোকেরা কোনরূপ চিন্তা না করিয়াই কথা বলিতে শুরু করে।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি অধিক কথা বলে সে মিথ্যাবাদী হয়। যার সম্পদ বেশী তাহার গোনাহ বেশী। যেই ব্যক্তির চরিত্র ভাল নহে, সে নিজের জন্য নিজের মুসীবত ডাকিয়া আনে।

হযরত আমর বিন দীনার বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কথা বলিবার পর তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মুখের মধ্যে কয়টি পর্দা আছে? জবাবে সে বলিল, আমার মুখে কেবল জিহ্বা ও দাঁত আছে। তিনি বলিলেন, উহার একটিও কি তোমাকে কথা বলা হইতে বিরত রাখিল না? (ইবনে আবিদ্দুনয়া)

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, এই কথা তিনি এমন ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন, যেই ব্যক্তি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁহার প্রশংসা করিতেছিল। এই সময় তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, মানুষকে তাহার জিহ্বার অহেতুক কথাই অধিক বিপদে ফেলিয়াছে।

জনৈক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, কোন মজলিসে বসিবার পর যদি কথা বলিতে ভাল লাগে, তবে নীরব থাকা বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে যদি নীরব থাকিতে ভাল লাগে, তবে সেই ক্ষেত্রে কথা বলা উচিত।

ইয়াজীদ ইবনে আবী হাবীব বলেন, আলেমদের পক্ষে কথা বলা অপেক্ষা কথা শোনা একটি পরীক্ষা বটে। সুতরাং যতক্ষণ কেহ কথা বলে, ততক্ষণ নীরব থাকা উচিত। কেননা, কথা শোনা নিরাপদ এবং কথা বলার মধ্যে যত অনিষ্টের আশংকা। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, মানুষের যেই অঙ্গটি পাক করা অধিক আবশ্যক, উহা হইল তাহার জিহ্বা।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) একবার অতিরিক্ত কথা বলায় অভ্যস্ত এক মহিলাকে দেখিয়া মন্তব্য করিলেন, এই মহিলা বোবা হইলে ইহা তাহার জন্য ভাল ছিল। হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ) বলেন, মানুষ দুইটি বিষয়ের কারণে বরবাদ হয়। উহার একটি হইল অধিক কথন এবং অপরটি অতিরিক্ত সম্পদ।

অবৈধ কথা বলা

যেইসব কথা গোনাহের সহিত সংশ্লিষ্ট উহাই অবৈধ কথা। যেমন নারীদের রূপ-লাবণ্য ও প্রেম-ভালবাসার আলোচনা করা, পাপের আসরের কথা বা ধনবানদের বিলাসিতার কথা আলোচনা করা কিংবা বাদশাহদের অনাচার ও পাপের কথা বলা ইত্যাদি সবই অবৈধ কথা। সুতরাং এই সবের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া হারাম। অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত কথা হারাম নহে; বরং উহা মোস্তাহাবের পরিপন্থী ও অপছন্দনীয়। কিন্তু বাতিল ও অবৈধ কথা বলা হারাম। তবে যেই ব্যক্তি অবৈধ কথা অতিরিক্ত বলিবে, তাহার পক্ষে সর্বদাই অবৈধ

কথায় জড়াইয়া পড়ার ঝুঁকি থাকিবে।

আজকাল তো বিশেষ গুরুত্বের সহিত বিনোদনমূলক আলোচনার আয়োজন করা হয়। এইসব আলোচনার আসরে সাধারণতঃ অবৈধ ও গোনাহের বিষয়ই আলোচনা করা হয়। অর্থহীন হাসি-তামাশা, মানুষের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ, গীবত-শেকায়েত, মানুষের দুর্নাম করা কিংবা কোন অপরাধকর্মের সলামরার্শ ইত্যাদিই হয় এইসব আসরের মূল আলোচ্য বিষয়।

মোটকথা, আজকাল আলোচনার আসরগুলির খুব কমই পাপাচার মুক্ত হয়। এইসব আসরে যেইসব অবৈধ ও গোনাহের বিষয় আলোচিত হয় উহার কোন সীমা পরিসীমা নাই। এই বিপদ হইতে মুক্তির একমাত্র উপায় হইল– দ্বীনী বিষয় এবং নেহায়েত আবশ্যকীয় বিষয় ব্যতীত অপর কোন আলোচনায় যুক্ত না হওয়া। অবৈধ আলোচনা এমনই বিপদজনক বিষয় যে, উহাতে জড়াইবার পর মানুষের ধ্বংস প্রায় অনিবার্য হইয়া পড়ে। অথচ এইসব বিষয়কে মানুষ নেহায়েতই মামুলী মনে করিয়া থাকে এবং উহার পরিণতি সম্পর্কে মানুষের ধারণা সুস্পষ্ট নহে। কিন্তু রোজ কেয়ামতে যখন মানুষের চোখের সামনে সকল কিছু সুস্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িবে, তখন তাহারা অনুভব করিতে পারিবে যে, দুনিয়াতে যেইসব গোনাহকে তাহারা নেহায়েত তুচ্ছ ও মামুলী মনে করিয়াছিল আজ উহাই তাহাদের জন্য কত ভয়াবহ পরিণতি ডাকিয়া আনিয়াছে।

হযরত বিলাল ইবনুল হারিস নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, মানুষ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির একটি কথা বলে এবং সে মনে করে, ইহা দ্বারা আল্লাহ পাকের বিশেষ কোন সন্তুষ্টি হাসিল হইবে না। অথচ আল্লাহ পাক ঐ একটি কথার কারণে কেয়ামত পর্যন্ত আপন সন্তুষ্টি লিখিয়া দেন। মানুষ কখনো আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির একটি কথা বলে এবং সে মনে করে, ইহা দ্বারা আল্লাহ পাক বিশেষ কোন অসন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু আল্লাহ জাল্লাশানুহু এই একটি কথার কারণে কেয়ামত পর্যন্ত আপন অসন্তুষ্টি লিখিয়া দেন। (ইবনে মাজা, তিরমিজী)

হযরত আলকামা (রাঃ) বলেন, হযরত বিলাল ইবনে হারিসের উপরোক্ত হাদীস আমাকে অনেক কথা বলা হইতে বিরত করিয়াছে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, মানুষ অনেক সময় বেপরওয়াভাবে এমন কথা বলিয়া ফেলে যে, উহার কারণে সে দোজখে পতিত হয়। আবার কোন সময় সে এমন কথা বলিয়া বসে যে, উহার কারণে সে বেহেশতের উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ

অর্থঃ "আমরা সমালোচকদের সঙ্গে সমালোচনা করিতাম।"

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে-

فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

অর্থঃ "তখন তোমরা তাহাদের সঙ্গে বসিবে না, যতক্ষণ না তাহারা প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া যায়। তাহা না হইলে তোমরাও তাহাদেরই মত হইয়া যাইবে।" (সূরা মুদ্দাসির - ৪৫ আয়াত)

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন, কেয়ামতের দিন সবচাইতে বড় গোনাহগার হইবে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নাফরমানীর কথা বেশী বলিয়াছিল। আনসারী ছাহাবী হযরত সিরীন (রাঃ) আল্লাহর নাফরমানীর বৈঠকের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, তোমরা অজু করিয়া লও; কেননা, তোমাদের কোন কোন কথা নাপাকি হইতেও নিকৃষ্ট।

কথার মধ্যে কথা বলা ও বিবাদ করা

মানুষের কথার মধ্যে কথা বলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ নিজের ভাইয়ের কথার মধ্যে কথা বলিও না, তাহার সঙ্গে ঝগড়া করিও না এবং এমন ওয়াদা করিও না যাহা তুমি পালন করিবে না। (তিরমিজী)

এক হাদীসে আছে, যেই ব্যক্তি হকের উপর থাকা সত্ত্বেও বিবাদ পরিহার করে, তাহার জন্য জান্নাতের উচ্চ স্তরে ঘর নির্মাণ করা হইবে। আর অন্যায় পক্ষ যদি বিবাদ পরিহার করে, তবে তাহার জন্য জান্নাতের মধ্য ভাগে ঘর নির্মাণ করা হইবে।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ মূর্তি পূঁজা ও শরাব পান হইতে বাঁচিয়া থাকার অঙ্গীকারের পর আমার নিকট হইতে আল্লাহ পাক যেই অঙ্গীকারটি গ্রহণ করেন, তাহা হইল- মানুষের সঙ্গে বিবাদ না করা। (ইবনে আবিদ্দুনয়া, তাবরানী, বায়হাকী)

এক রেওয়ায়েতে আছেঃ কোন জাতি যদি আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে হেদায়েত পাওয়ার পর (পুনরায়) পথ ভ্রষ্ট হয়, তবে তাহা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়ার কারণে।

হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছেঃ কথার মধ্যে কথা বলা ত্যাগ না করা পর্যন্ত মানুষের ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয় না। আরো এরশাদ হইয়াছেঃ যেই ব্যক্তির মধ্যে ছয়টি অভ্যাস থাকে, সে খাঁটি ঈমানের স্তরে পৌছিয়া যায়–

১. গরমের দিনে রোজা রাখা।

২. তলোয়ার দ্বারা আল্লাহর দুশমনদেরকে হত্যা করা।

৩. বর্ষার দিনে আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়া।

৪. বিপদে ধৈর্য ধারণ করা।

৫. শীতের সময় মন না চাহিলেও পূর্ণরূপে অজু করা। এবং–

৬. ন্যায় পক্ষ হইয়াও বিবাদ বর্জন করা।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) বলেন, দ্বীনের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টিকারী ব্যক্তি স্থিরমনা ও সুসংহত হইতে পারে না। বরং এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ অস্থিতিশীল হইযা থাকে। হযরত মুসলিম বিন য়াসার (রাঃ) বলেন, তোমরা বিতর্ক পরিহার করিয়া চল। বিতর্কের সময় আলেম ব্যক্তিও জাহেলে পরিণত হয়। এই সময় শয়তান তাহার দ্বারা অপরাধ সংগঠনের প্রত্যাশী হয়। হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, দ্বীনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের কোন স্থান নাই। ঝগড়া-বিবাদ করিলে অন্তর কঠোর হইয়া উহাতে হিংসা-বিদ্বেষের বীজ স্থাপিত হয়।

হযরত লোকমান হেকিম নিজের সন্তানকে নসীহত করিয়া বলেন, বৎস! আলেমদের সঙ্গে বিবাদ করিও না। অন্যথায় তাহাদের অন্তরে তোমার প্রতি ঘৃণা পয়দা হইবে। হযরত বিলাল বিন সায়াদ (রাঃ) বলেন, যদি কাহাকেও ঝগড়াটে স্বভাব ও নিজের রায়ের উপর চলিতে দেখ, তবে মনে করিবে যে, তাহার পারলৌকিক পতন নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, অতি সাধারণ বিষয়েও মানুষের সঙ্গে বিতর্ক করিও না। মনে কর, আনার ফল লইয়া আমার ভাইয়ের সঙ্গে আমার মতানৈক্য হইল। আমি বলিলাম, আনার টক আর আমার ভাই বলিলেন, আনার মিষ্টি। এখন এই ক্ষুদ্র ঘটনাটিই হয়ত আমাদের মধ্যে বিরোধের ভিত্তি রচনা করিয়া দিবে এবং পরবর্তীতে দেখা যাইবে হয়ত বিচারকের দরবারে আমার ভাই আমার বিপক্ষে কথা বলিতেছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন, তুমি ইচ্ছা করিলে যে কোন মানুষের সঙ্গেই বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পার কিন্তু সামান্য ঝগড়ার কারণেই এই বন্ধুত্ব ভঙ্গ হইয়া চরম অবর্গ সৃষ্টি হইতে পারে।

ইবনে আবী লায়লা বলেন, আমি কখনো আমার বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া করি না। কেননা, উহার ফলে হয় সে অপমান বোধ করিবে কিংবা তাহার ক্রোধ উত্তেজিত হইবে। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি সবসময় ঝগড়া বিবাদ করে, তাহার পক্ষে গোনাহগার হওয়ার জন্য অন্য কোন অপরাধের আবশ্যক হয় না।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, তিনটি বিষয়ের কারণে এলেম হাসিল করিবে না এবং তিনটি বিষয়ের কারণে এলেম হাসিল করা বর্জনও করিবে না। যেই তিনটি বিষয়ের জন্য এলেম হাসিল করা উচিৎ নহে, তাহা হইল– বাহাস (বিতর্ক), অহংকার ও রিয়া। আর যেই তিনটি বিষয়ের কারণে এলেম অন্বেষণ বর্জন করা উচিৎ নহে, তাহা হইল– লজ্জা, সংসার বিরাগ ও মূর্খতার উপর তুষ্ট থাকা।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন; যেই ব্যক্তি অধিক মিথ্যা কথা বলে, তাহার সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। যেই ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে তাহার সম্মান ও ব্যক্তিত্ব লোপ পায়। যেই ব্যক্তি সর্বদা চিন্তাযুক্ত থাকে, তাহার দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে। যেই ব্যক্তির চরিত্র ভাল নহে, সে নিজের মুসীবত নিজেই ডাকিয়া আনে।

হযরত মাইমুন বিন মেহরান (রহঃ)-কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইহার কারণ কি যে, আপনি কাহাকেও শত্রুতার কারণে ত্যাগ করেন না (বরং কাহাকেও ত্যাগ করিলে উহার কারণ হয় অন্য কিছু)। জবাবে তিনি বলিলেন, আমি কাহারো সঙ্গে বিবাদ করি না এবং সখ্যতাও করি না।

কথার মধ্যে কথা বলা ও 'জিদাল' এর সংজ্ঞা

মানুষের কথার মধ্যে কথা বলা এবং ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্কের অন্তহীন নিন্দা বর্ণিত আছে। উপরে কেবল নমুনা হিসাবে উহার কতক বিবরণ উল্লেখ করা হইল। কথার মধ্যে কথা বলার বিষয়টিকে হাদীসে পাকে مراء শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে। مراء শব্দের অর্থ হইল– কাহারো কথার মধ্যে ত্রুটি বাহির করিয়া উহাতে আপত্তি উত্থাপন করা। এই ত্রুটি বক্তার কথা, অর্থ বা তাহার নিয়ত সংক্রান্তও হইতে পারে। যেমন– বক্তাকে বলা হইল, "তোমার কথা ব্যকরণসম্মত হয় নাই" ইহা বলা ঠিক নহে। কেননা, মানুষের কথার মধ্যে শব্দগত ত্রুটি বিভিন্ন কারণেই হইতে পারে। যেমন, অনেকেরই ভাষাজ্ঞান ভাল থাকে না আবার অনেকে হয়ত যাহা বলিতে চাহে মুখ হইতে তাহা বাহির না হইয়া অন্য কিছু বাহির হইয়া পড়ে। তো মানুষের কথার মধ্যে এই জাতীয়

শব্দগত ত্রুটি ধরা জায়েজ নহে।

অর্থগত ত্রুটি আবিষ্কারের ধরণ হইলঃ যেমন বলা হইল, তুমি অমুক কথাটি ভুল বলিয়াছ কিংবা অমুক বিষয়ে তুমি ভুল সিদ্ধান্ত দিয়াছ, তোমার ধারণা সঠিক নহে ইত্যাদি। অনুরূপভাবে মানুষের নিয়তের মধ্যে ত্রুটি আবিষ্কারের অবস্থা হইল– যেমন বলা হইল, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যদিও সত্য, কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য সত্য প্রকাশ করা নহে; বরং এই ক্ষেত্রে তোমার উদ্দেশ্য ভিন্ন। বস্তুতঃ এইরূপ মন্তব্য করা ঠিক নহে।

এই সকল ক্ষেত্রে কিছু জিজ্ঞাসা করার সময় যদি ত্রুটি আবিষ্কার উদ্দেশ্য না হইয়া কেবল সেই বিষয়ে ধারণা লাভ করা উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

জিদাল অর্থ প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করিয়া দেওয়া তাহার অপরাধ-অক্ষমতা ও মূর্খতা প্রকাশ করিয়া দেওয়া যেন মানুষের নিকট সে অপমানিত হয় এবং মানুষ তাহাকে লইয়া হাসি-তামাশা করে। অর্থাৎ জিদালের লক্ষণ হইল, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করা। এইসব দুষ্ট ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হইল, মোবাহ বিষয়েও নীরব থাকা।

খুসুমাত

খুসুমাত অর্থ শত্রুতা ও বিবাদ। ইহা নিন্দনীয়। ইতিপূর্বে জিদালের সংজ্ঞা বর্ণনা করা হইয়াছে। আলোচ্য খুসুমাতের মধ্যেও জিদাল বিদ্যমান। এই জিদাল করা হয় কাহারো সম্পদ দখল করার ক্ষেত্রে। সুতরাং খুসুমাতের অর্থ দাঁড়াইতেছে– কাহারো অর্থ-সম্পদ দখল করার জন্য বিবাদ করা।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ "যেই ব্যক্তি অধিক ঝগড়া করে সে আল্লাহ পাকের নিকট অধিক অপছন্দনীয়। (বোখারী)

জনৈক বুজুর্গ বলেন, খুসুমাত হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা, খুসুমাত দ্বীনকে বরবাদ করিয়া দেয়। মোত্তাকী ও পরহেজগার লোকেরা কখনো বিবাদ করে না।

হযরত কোতাইবা (রহঃ) বলেন, একবার আমি এক জায়গায় বসিয়া ছিলাম। এমন সময় বশীর ইবনে আব্দুল্লাহ সেই স্থান অতিক্রম করার সময় তথায় আমাকে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এখানে বসিয়া আছ কেন? আমি বলিলাম, আমার চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিবাদ চলিতেছে,

এই কারণে ঘর হইতে বাহির হইয়া এখানে চলিয়া আসিয়াছি। আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, আমার উপর তোমার পিতার কিছু অনুগ্রহ আছে। আজ আমি উহার প্রতিদান দিতে চাহিতেছি। মনে রাখিও, বিবাদ অপেক্ষা মন্দ বিষয় ইহজগতে আর কিছু নাই। বিবাদের ফলে মানুষের দ্বীনদারী বরবাদ হয়, সভ্যতা ও ভদ্রতা বিনষ্ট হয় এবং জীবনের সুখ-শান্তি একেবারে অন্তর্হিত হয়। আর একবার উহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে এবাদত বন্দেগীর পরিবর্তে জীবনব্যাপী কেবল উহাতেই জড়াইয়া থাকিতে হয়।

ইবনে কোতাইবা (রহঃ) বলেন, হযরত বশীর ইবনে আব্দুল্লাহর উপরোক্ত নসীহত শুনিয়া আমি তথা হইতে প্রস্থান করার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমার প্রতিপক্ষ অদূরেই উপবিষ্ট ছিল। সে আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইতেছ? আমি বলিলাম, আর বিবাদ নহে, আমি বাড়ী ফিরিতেছি। সে বলিল, তবে নিশ্চয় তুমি আমার অধিকার মানিয়া লইয়াছ। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাহা অস্বীকার করিয়া বলিলাম, না; তোমার অধিকার মানিয়া লইতেছি না। বরং আমার অধিকার উদ্ধারের তুলনায় আমার আত্মার ইজ্জতের হেফাজত অধিক আবশ্যক মনে করিতেছি। এইবার সে বলিল, যদি তাহাই হয়, তবে আমিও বিবাদ পরিহার করিয়া বিতর্কিত বিষয়টি তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি। আমি আর কখনো তাহা দাবী করিব না।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কোন জালেম যদি অন্যায়ভাবে কাহারো বিষয়-সম্পদ দখল করিয়া লয়, তবে সেই ক্ষেত্রে তো উহার প্রতিবাদ এবং প্রয়োজনে মামলা-মোকাদ্দমাও করিতে হইবে। সুতরাং খুসুমাত ও মামলা-মোকাদ্দমা মাত্রই তো নিন্দনীয় হওয়ার কথা নহে। ইহার জবাব হইল, আমরা আমভাবে সকল বিবাদ ও মামলা-মোকদ্দমাকে নিন্দনীয় বলিতেছি না। অনেক সময় অন্যায় পক্ষও মামলা করে, আবার অনেক সময় কে হক পক্ষ আর কে নাহক পক্ষ তাহা না জানিয়াও মামলা করা হয়। যেমন উকিলগণ হক-নাহক যাচাই না করিয়াই নিজের মক্কেলের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিয়া মামলা পরিচালনা করে। অনেক সময় প্রাপ্য হকের অধিক দাবী করিয়াও মামলা করা হয়। এই জাতীয় বিবাদ-খুসুমাত ও মামলা-মোকাদ্দমা অবশ্যই নিন্দনীয়। বিবাদের মধ্যে অনেক সময় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য অকথ্য ভাষা ব্যবহার করা হয়। অথচ নিজের হক দাবী করার জন্য মুখ খারাপ করার প্রয়োজন হয় না। বিধিসম্মতভাবেও তাহা দাবী করা যায়। অনেক সময় দৃশ্যতঃ নিজের প্রাপ্য আদায়ের জন্যই বিবাদ করা হয় বটে, কিন্তু আসল অবস্থা যাচাই

করিলে দেখা যায়– প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করাই হয় মূল উদ্দেশ্য। অনেক সময় তো ঘোষণা দিয়াই বলা হয় যে, আমার হক এমনই মামুলী বিষয় যে, তাহা না পাইলেও আমার এমন কিছু আসেযায় না, বরং দাবীকৃত বস্তুটি হাতে পাওয়ার পর আমি তাহা কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দিব কিংবা আগুনে জ্বালাইয়া দিব– তবুও প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা না করিয়া ছাড়িতেছি না। অর্থাৎ এইরূপ ক্ষেত্রে নিজের হক আদায় করা উদ্দেশ্য হয় না, বরং বিপক্ষকে অপমান করাই হয় আসল উদ্দেশ্য। তো এই জাতীয় বিবাদ গুরুতরভাবেই নিন্দনীয়।

মজলুম ব্যক্তি যদি নিজের হক আদায়ের জন্য শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মামলা করে এবং এই ক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যক্তি-আক্রোশ, হিংসা, বিদ্বেষ, হীন শত্রুতা এবং অন্যায়ভাবে প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধন উদ্দেশ্য না হয়, তবে এই জাতীয় মামলা নাজায়েজ নহে। তবে মামলা-মোকদ্দমা ছাড়াই যদি বিবাদ মীমাংসা হওয়ার উপায় থাকে, তবে সেই ক্ষেত্রে মামলা করা উচিৎ নহে। কেননা, মামলা-মোকদ্দমা ও বিবাদে অবতীর্ণ হওয়ার পর নিজের জবানকে সংযত রাখা সম্ভব হয় না এবং এই বিবাদের কারণেই অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ ও ক্রোধের আগুণ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গিয়াছে যে, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে নিজেকে শরীয়তের সীমায় স্থির রাখা সম্ভব হয় না।

ঝগড়া-বিবাদের দীর্ঘসূত্রীতার একটি পর্যায় এমন আসে যে, তখন আর বিবাদের মূল বিষয়ের প্রতি কাহারো নজর থাকে না এবং উভয় পক্ষই কেমন করিয়া প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করা যায় কেবল উহার ফিকিরেই নিরত হয় এবং এই উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করা হয়। একজন কোনভাবে কষ্ট পাইলে বা অপমানিত হইলে অপর জনের যেন আনন্দের আর কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না।

এখন সর্বপ্রথম যেই ব্যক্তি এই বিবাদের সূচনা করিয়াছে, এইসব গর্হিত কর্মের জন্য প্রধানতঃ তাহাকেই দায়ী হইতে হইবে। কোন ব্যক্তি-বিশেষ যদি বিবাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলে এবং শরীয়তের খেলাফ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তবে এই ক্ষেত্রে সে হয়ত না জায়েজ ক্রিয়া-কর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে বটে, কিন্তু বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার পর তাহার পক্ষেও পরিপূর্ণ এতমিনান ও নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব হইবে না। বিবাদের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত প্রতিনিয়ত তাহাকে এক কঠিন মর্মপীড়া ও পেরেশানীতে নিমগ্ন থাকিতে হইবে। এমনকি প্রতিপক্ষকে কেমন করিয়া শায়েস্তা করা যায় এইসব

চিন্তা নামাজের মধ্যেও তাহার মাথায় ঘুরপাক খাইতে থাকিবে।

খুসুমাত, জিদাল ও ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ অকথ্য ভাষার ব্যবহার, প্রতিপক্ষকে হীন, তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়। এই ঝগড়া-বিবাদের সর্বনিম্ন অনিষ্ট হইল– অতঃপর পরস্পরের সঙ্গে ভালভাবে কথা বলার পরিস্থিতিও বিনষ্ট হইয়া যায়। অথচ উত্তম কথা হইল উত্তম সামাজিকতা ও সৌজন্যবোধের অন্যতম উপাদান এবং ইহা ছাওয়াবের কাজ। উত্তম কথাবার্তার সর্বনিম্ন পর্যায় হইল, প্রতিপক্ষের মতামতের সহিত ঐকমত্য পোষণ করা।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ "উত্তম কথা ও খানা খাওয়ানোর কারণে তোমাদিগকে বেহেশতে স্থান দেওয়া হইবে।" (তাবরানী)

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

–এবং মানুষের সঙ্গে ভাল কথা বলিবে। (সূরা বাক্বারা - ৮৩ আয়াত)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, বেহেশতের কোন কোন ঘর এমন স্বচ্ছ ও পরিষ্কার যে, উহার ভিতর হইতে বাহিরের দৃশ্য এবং বাহির হইতে ভিতরের দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যায়। আল্লাহ এইসব ঘর সেই সকল ব্যক্তিদের জন্য নির্মাণ করিয়াছেন যাহারা খানা খাওয়ায় এবং নরম ভাষায় কথা বলে। (তিরমিজী)

কথিত আছে যে, একবার হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট দিয়া একটি শুকর যাওয়ার সময় তিনি উহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ভালভাবে চলিয়া যাও"। উপস্থিত লোকেরা আরজ করিলেন, আপনি একটি নাপাক জানোয়ারের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলিলেন? জবাবে তিনি বলিলেন, "ইহা আমার নিকট ভাল মনে হয় না যে, আমার জিহ্বা মন্দ ভাষায় অভ্যস্ত হউক।"

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

الكلمة الطيبة صدقة

–উত্তম কথা (বলাও) সদকা। (মুসলিম)

এক হাদীসে আছেঃ আগুণ হইতে বাঁচ– এক টুকরা খেজুর দিয়া হইলেও। যদি তাহা না থাকে, তবে একটি ভাল কথা বলিয়া। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, পুণ্য একটি সহজ আমল। আর তাহা হইল, হাসি মুখে ও নরম ভাষায় কথা বলা।

জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, নরম ভাষা গোপন কপটতার ময়লা দূর করিয়া দেয়। অপর এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, আল্লাহ পাক কোন কথা দ্বারা অসন্তুষ্ট হন না। তবে শর্ত হইল, তাহার সঙ্গীগণ যেন সন্তুষ্ট থাকে। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হইল, নিজের সাথী-সঙ্গীদের সঙ্গে ভাল কথা বলা। হয়ত উহার ফলে আল্লাহ পাক নেক বান্দাদের মত ছাওয়াব দান করিবেন।

উপরে মানুষের সঙ্গে নরম ভাষা ব্যবহার ও উত্তম কথা বলা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইল। বস্তুতঃ উত্তম কথা হইল ঝগড়া-বিবাদের বিপরীত বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে যাবতীয় বিবাদ-বিসংবাদ হইতে হেফাজত করিয়া মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার ও সৌজন্যমূলক কথা বলার তৌফিক দান করুন।

কথার মাধুর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লৌকিকতা

অধিকাংশ বক্তার অভ্যাস হইল নিজের কথাকে প্রাঞ্জল ও মাধুর্যময় করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে সাজাইয়া-গুছাইয়া বলা এবং মূল বক্তব্যের পূর্বে বেশ ভনিতা করিয়া একটা ভূমিকা দাঁড় করানো। এইসব লৌকিকতা নিষিদ্ধ।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

انا و اتقياء امتي براء من التكلف

অর্থঃ "আমি এবং আমার উম্মতের পরহেজগার ব্যক্তিগণ লৌকিকতা হইতে দূরে।"

আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ তোমাদের মধ্য হইতে আমার নিকট সব চাইতে নিকৃষ্ট ও বৈঠকে আমা হইতে অধিক দূরে সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা বাজে কথা বলে, অতিরিক্ত কথা বলে এবং কথার মধ্যে লৌকিকতা অবলম্বন করে। (আহমাদ, তিরমিজী)

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

شرار امتى الذين غدوا بالنعيم يأكلون الوان الطعام و يلبسون
الوان الثياب يتشدقون في الكلام

অর্থঃ আমার উম্মতের মধ্যে নিকৃষ্ট লোক হইল যাহারা ধন-সম্পদের মধ্যে লালিত হয়, নানা রকম খাদ্য গ্রহণ করে, বৈচিত্রময় পোশাক পরিধান করে এবং

কথা বলার সময় লৌকিকতা করে। (ইবনে আবিদ্দুনয়া)

এক রেওয়ায়েতে আছে- খবরদার! অতিরঞ্জনকারীগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। (মুসলিম)

হযরত ওমর (রাঃ) বলেনঃ "কথার মধ্যে উচ্ছ্বসিত হওয়া এবং কথা লম্বা করা শয়তানী কাজ।" একবার হযরত ওমর ইবনে সা'দ নিজের পিতার নিকট কিছু জরুরতের কথা বলিতে আসিয়া এক দীর্ঘ ভূমিকা পেশ করিলেন।

হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, বৎস! নিজের অভাব ও জরুরতের কথা বলিতে আসিয়া আজ তুমি যেই দীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা করিলে, ইতিপূর্বে আর কখনো এইরূপ কর নাই। আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, এমন এক সময় আসিবে, যখন মানুষ চিবাইয়া চিবাইয়া কথা বলিবে- যেমন গাভী ঘাস চিবায়। অর্থাৎ নিজের অভাব ও জরুরতের কথা বলার পূর্বে পুত্রের ভূমিকা বর্ণনাকে হযরত সা'দ পছন্দ করেন নাই। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, কথার মধ্যে অনাবশ্যক ভনিতা ও লৌকিকতা নিন্দনীয়।

মোটকথা, কথার উদ্দেশ্য হওয়া চাই- যাহা বলা হইল তাহা যেন উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝিতে পারে। ইহার অতিরিক্ত যাহা কিছু করা হইবে তাহাই লৌকিকতার মধ্যে গণ্য হইবে।

শরীয়ত এই জাতীয় লৌকিকতা করিতে নিষেধ করিয়াছে। অবশ্য খোৎবা ও বয়ানের মধ্যে উত্তম ভাষা ব্যবহার করা ভাল। তবে শর্ত হইল উহাতে যেন কোনরূপ অতিরঞ্জন ও বাহুল্য না থাকে। ওয়াজ ও খোৎবার উদ্দেশ্য হয় শ্রোতা সাধারণকে দ্বীনের উপর আমল করিতে উৎসাহিত করা।

তো সাধারণ কথার মধ্যে ওয়াজের অনুকরণ করা মূর্খতা বটে। বরং এইরূপ লৌকিকতা রিয়ার মধ্যে গণ্য।

অশ্লীল কথন

অশ্লীল কথা ও গালাগাল সর্বাবস্থায় নিন্দনীয়। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন-

ايـاكم و الفحش فان الله لا يحب الفحش و التفحيش

অর্থঃ তোমরা অশ্লীলতা হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা, আল্লাহ পাক অশ্লীলতা ও অনর্থক বকাবকি পছন্দ করেন না। (নাসাঈ, হাকিম)

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে যেই সকল মুশরিক প্রাণ হারাইয়াছিল,

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকেও গালি দিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেনঃ তাহাদিগকে গালি দিও না। কেননা, তোমরা যাহা বল, তাহা তাহাদের নিকট পৌঁছায় না। বরং উহা দ্বারা কেবল জীবিতদেরই কষ্ট হয়। সাবধান! মন্দ বলা নীচতা।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে–

ليس المؤمن بالطعان و لا اللعان و لا الفاحش و لا البذي

অর্থঃ "দোষারোপকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী এবং গালাগালকারী মোমেন নহে।" (তিরমিজী)

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

الجنة حرام على كل فاحش يدخلها

অর্থাৎ– "প্রত্যেক অশ্লীলভাষীর জন্য বেহেশতে প্রবেশ হারাম।"

(ইবনে আবিদ্দুন্‌য়া)

এক হাদীসে আছে– দোজখে অবস্থানকারী চার ব্যক্তি দোজখবাসীদিগকে কষ্ট দিতে থাকিবে। অথচ এই চার ব্যক্তি নিজেরা পূর্ব হইতেই দোজখের কষ্ট ভোগ করিতে থাকিবে। অর্থাৎ উত্তপ্ত পানি এবং আগুনের মধ্যে দৌঁড়াইতে থাকিবে। নিজেদের খারাবী ও বরবাদীর জন্য রোদন করিতে থাকিবে। এই চার জনের মধ্যে একজনের অবস্থা এমন হইবে যে, তাহার মুখ হইতে রক্ত ও পূঁজ ঝরিতে থাকিবে। দোজখবাসীগণ তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, হে বিতাড়িত হতভাগা! তোমার এই অবস্থা কেন? তুমি আমাদের কষ্ট আরো বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছ। সে বলিবে, আমার মুখ দ্বারা অশ্লীল কথা যাহা আসিত তাহা বলিয়াই আমি সহবাসের মত তৃপ্তি অনুভব করিতাম। (ইবনে আবিদ্দুন্‌য়া)

একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া ফরমাইলেন–

يا عائشة لو كان فحش رجلا لكان رجل سوء

অর্থাৎ, "হে আয়েশা! অশ্লীল ভাষ্য যদি কোন মানুষের ছুরত ধারণ করিত, তবে সে অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানুষ হইত।"

এক রেওয়ায়েতে আছে, যাহারা অশ্লীল কথা বলে, বেহুদা কথা বলে এবং বাজারে চিৎকার করে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে পছন্দ করেন না।

হযরত ইবরাহীম বিন মাইসারাহ বলেন, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, অশ্লীলভাষী কেয়ামতের দিন কুকুরের ছুরতে কিংবা উহার উদরস্থিত হইয়া আসিবে।

হযরত আহনাফ বিন কায়েস (রহঃ) বলেন, আমি কি তোমাদিগকে সর্বাধিক নিকৃষ্ট ব্যাধি সম্পর্কে অবহিত করিব না? তাহা হইল অশ্লীল কথা ও মন্দ স্বভাব।

অশ্লীল কথনের সংজ্ঞা

উপরে অশ্লীল কথার নিন্দায় হাদীসের উদ্ধৃতিসহ কিছু জরুরী বিষয় আলোচনা করা হইল। এক্ষণে আমরা উহার সংজ্ঞা ও পরিচয় উল্লেখ করিব। অশ্লীলতা হইল– লজ্জাজনক বিষয়সমূহ স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা। যেমন লজ্জাস্থানের নাম মুখে উল্লেখ করা ইত্যাদি। অশ্লীল কথা বলিতে মোটামুটিভাবে সহবাস এবং উহার আনুসঙ্গিক বিষয়ের সহিতই সংশিষ্ট। বিকৃত রুচির লোকেরা এইসব বিষয় স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করে না। কিন্তু নেক ও সভ্য লোকেরা এইসব বিষয় মুখে আনিতে লজ্জাবোধ করে এবং একান্ত আবশ্যক হইলে ইশারা-ইঙ্গিতে তাহা উল্লেখ করে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা লজ্জাশীল, তিনি গোনাহ্ ক্ষমা করেন এবং ইঙ্গিতে বর্ণনা করেন। যেমন পবিত্র কোরআনে সহবাসকে 'লামাস' বা স্পর্শ শব্দ দ্বারা ইশারায় বর্ণনা করা হইয়াছে। লামাস, দুখুল এবং সোহবত ইত্যাদি শব্দগুলি সহবাসের ইঙ্গিতবাহী শব্দ। এইসব শব্দের ব্যবহারে কোন অশ্লীলতা নাই। কিন্তু বদকার ও নির্লজ্জ লোকেরা সরাসরি সহবাস শব্দটি উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, বরং উহাকে আরো বিকৃত ও নগ্নভাবে প্রকাশ করার জন্য তাহারা এমন কিছু অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে যাহা শুনিলে ভদ্রলোকের মাথা হেট হইয়া আসে। অসঙ্গত শব্দসমূহের মধ্যে কতক শব্দে অশ্লীলতা কম আবার কতক শব্দে তাহা বেশী। এই অশ্লীলতায় দেশ, জাতি ও স্থানভেদে বিভিন্নতা রহিয়াছে। যাহাই হউক, যেই শব্দে অশ্লীলতা কম উহার ব্যবহার মাকরূহ এবং যেই শব্দে অশ্লীলতা বেশী উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী শব্দসমূহও ঝুঁকিবিহীন নহে।

তো অশ্লীলতা কেবল সহবাস সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যেই সীমিত নহে, বরং যাহাকিছু অপছন্দনীয় ও শ্রুতিকটু উহার সবই ইহাতে গণ্য। যেমন মল-মূত্র ত্যাগের জন্য পেশাব-পায়খানা শব্দদ্বয় 'গু-মুত' অপেক্ষা উত্তম। অর্থাৎ এমন

গোপনীয় বিষয় যাহার প্রকাশ বিব্রতকর উহা গোপন রাখাই শ্রেয়। অনুরূপভাবে নারীদের উল্লেখও ইশারায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন "আমার স্ত্রী" এই কথা বলিয়াছে" না বলিয়া "ঘর হইতে বলা হইয়াছে" "পর্দার আড়াল হইতে বলা হইয়াছে" কিংবা "বাচ্চার মা বলিয়াছে" ইত্যাদি বলা ভাল। অর্থাৎ নারীদের উল্লেখ সরাসরি করা হইলে তাহা অশ্লীলতায় যুক্ত হওয়ার আশংকা থাকে। এমনিভাবে কাহারো মধ্যে ঘৃণা উদ্রেককারী কোন বিমারী থাকিলে তাহা সরাসরি উল্লেখ করা ঠিক নহে। যেমন- ধবল, কুষ্ঠ, অর্শ, একশিরা ইত্যাদি রোগের নাম উল্লেখ না করিয়া "কঠিন ব্যাধি" বলা বাঞ্ছনীয়।

আলা বিন হারূন বলেন; হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) জিহ্বার খুব হেফাজত করিতেন এবং কথার মধ্যে শালীনতা বজায় রাখিতেন। একবার তাহার বগলে ফোঁড়া হইলে আমরা তাহাকে দেখিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কোথায় ফোঁড়া হইয়াছে? আমাদের উদ্দেশ্য ছিল- বিষয়টাকে তিনি কিভাবে উল্লেখ করেন তাহা লক্ষ্য করা। আমাদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিলেন, বাহুর ভিতরের দিকে ফোঁড়া হইয়াছে। অর্থাৎ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ বগলের কথাও স্পষ্ট শব্দে উল্লেখ করা পছন্দ করেন নাই।

এক আরব বেদুঈন একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তাহার নিবেদনের জবাবে তিনি এরশাদ করিলেন-

"আল্লাহকে ভয় কর। তোমার মধ্যে কোন বিষয় দেখিয়া যদি কেহ তোমাকে লজ্জা দেয়, তবে তুমিও তাহার কোন বিষয় দেখিয়া তাহাকে লজ্জা দিওনা। ফলে সে শাস্তি ভোগ করিবে এবং তুমি ছাওয়াব প্রাপ্ত হইবে। আর কোন কিছুকে গালি দিওনা।" (আহমাদ, তাবরানী)

একদা আয়াজ ইবনে হাম্মার (রাঃ) পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি মর্যাদায় আমার তুলনায় কম এবং সে আমাকে গালি দেয়। এখন আমি উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে তাহা অসঙ্গত হইবে কি? আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ গালমন্দকারী উভয়ই শয়তান হইয়া থাকে। তাহারা একে অপরকে মিথ্যাবাদী বলে এবং অপবাদ আরোপ করে।

(আবু দাউদ তাইয়ালেসী, আহমাদ)

একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন–

سباب المؤمن فسوق و قتالق كفر

অর্থাৎ– "মোমেনকে গালি দেওয়া পাপ এবং তাহার সঙ্গে লড়াই করা কুফর।" (বোখারী, মুসলিম)

একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সবচাইতে বড় গোনাহ হইল পিতামাতাকে গালি দেওয়া। উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, মানুষ কেমন করিয়া নিজের পিতামাতাকে গালি দিবে? এরশাদ হইলঃ মানুষ অন্যের পিতামাতাকে গালি দেয় এবং জবাবে সেও তাহার পিতামাতাকে গালি দেয়, এইভাবেই সে আপন পিতামাতাকে গালি দেওয়ার কারণ হয়। (আহমাদ, আবু য়া'লা, তাবরানী)

অভিশাপ দেওয়া

অভিশাপ দেওয়া ভাল নহে। মানুষ, জীব-জানোয়ার কিংবা জড়পদার্থ যাহাকেই অভিশাপ দেওয়া হউক– ইহা নিন্দনীয়।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

لا يكون المؤمن لعانا

মোমেন অভিশাপকারী হয় না। (তিরমিজী)

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে–

لا تلاعنوا بلعنة الله و لا بغضبه و لا بجهنم

অর্থঃ তোমরা পরস্পর আল্লাহর লা'নত, আল্লাহর গজব কিংবা জাহান্নাম দ্বারা অভিসম্পাত করিও না। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরকে তাহার এক গোলামের প্রতি অভিশাপ করিতে শুনিলে তিনি হযরত আবু বকরের নিকট গিয়া বলিলেন, হে আবু বকর! ছিদ্দিকও অভিশাপ বর্ষণ করে কি? কখনো নহে, কা'বার রবের কসম! কখনো নহে। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে সেই গোলামকে আজাদ করিয়া দিলেন এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গিয়া আরজ করিলেন, আমি আর কখনো এইরূপ ভুল করিব না। (ইবনে আবিদ্দুনয়া)

এক রেওয়ায়েতে আছেঃ অভিশাপকারীগণ কেয়ামতের দিন সুপারিশকারী

কিংবা স্বাক্ষী হইতে পারিবে না। (মুসলিম)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নিজের উটের উপর সওয়ার হইয়া সফর করিতেছিল। এই সময় সে নিজের উটকে অভিশাপ দিলে আল্লাহর নবী তাহাকে বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দা! এই অভিশাপপ্রাপ্ত উটের উপর সওয়ার হইয়া আমাদের সঙ্গে চলিও না। (ইবনে আবিদ্দুনয়া) অর্থাৎ লোকটিকে অভিশাপ হইতে বারণ করিবার জন্যই তিনি ইহা বলিয়াছিলেন।

অভিশাপের সংজ্ঞা

অভিশাপ অর্থ আল্লাহর রহমত হইতে দূরে সরাইয়া দেওয়া। এই শব্দটি এমন ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা বৈধ হইতে পারে, যেই ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর রহমত হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার মত অবস্থা বিদ্যমান। যেমন– কুফুর ও জুলুম। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে এমন বলা বৈধ হইবে যে জুলুমকারীর উপর আল্লাহর অভিশাপ বা যেই ব্যক্তি কুফর করে তাহার উপর আল্লাহর অভিশাপ। অভিশাপ বর্ষণ করার বিষয়টা যেহেতু খুবই নাজুক, সুতরাং এই ক্ষেত্রে অতীব সতর্কতার সহিত কেবল শরীয়ত অনুমোদিত শব্দই প্রয়োগ করা যাইবে। কেননা, ইহা এক অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী যে, তাহার অভিশপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ আপন রহমত হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছেন। ইহা কেবল আল্লাহ পাকই বলিতে পারেন এবং তিনি স্বীয় রাসূলকে জানাইয়া দিলে তিনি বলিতে পারেন।

অভিশাপের উপকরণ ও স্তর

যেই সমস্ত অপরাধের কারণে মানুষ অভিশাপের উপযুক্ত হয় তাহা তিনটি। যেমন– কুফর, বেদআত ও পাপাচার। এইসব ক্ষেত্রে অভিশাপ করার পন্থা তিনটি–

(এক) ব্যাপক বিশেষণ সহকারে অভিশাপ দেওয়া। যেমন "কাফের, বেদআতী ও পাপীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হউক।"

(দুই) নির্দিষ্ট বিশেষণ উল্লেখপূর্বক অভিশাপ দেওয়া। যেমন– ইহুদী, নাসারা, রাফেজী, সুদখোর, ব্যভিচারী ও জালেমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ হউক। এই দুই পন্থায় অভিশাপ করা জায়েজ। তবে বেদআতীদের উপর অভিশাপ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। কেননা, কোনটি বেদআত তাহা জানা বড় কঠিন বিষয়।

(তিন) কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর অভিশাপ করা। ইহা বিপদজনক। অর্থাৎ সরাসরি কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম লইয়া তাহার উপর অভিশাপ করা যাইবে না। যেমন– জায়েদ কাফের, ফাসেক ও বেদআতী হইলেও "জায়েদের উপর অভিশাপ হউক" এমন বলা যাইবে না। তবে শরীয়তে যেই ব্যক্তি অভিশপ্ত বলিয়া প্রমাণিত, তাহার নাম লইয়া অভিশাপ করাতে কোন দোষ নাই। যেমন ফেরাউন ও আবু জাহেলের নাম লইয়া অভিশাপ করা যাইবে। কেননা, শরীয়তে ইহা প্রমাণিত যে, তাহারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে। কিন্তু জীবিত কোন ব্যক্তিবিশেষ কাফের হইলেও তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করা ঠিক নহে। কেননা, সেই ব্যক্তি তো মৃত্যুর পূর্বে মুসলমানও হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং এমতাবস্থায় ইহা বলা কেমন করিয়া সঙ্গত হইতে পারে যে, "সে আল্লাহর রহমত হইতে দূরে"? এখানে তো বড় জোড় এতটুকু বলা যাইতে পারে যে, তাহার উপস্থিত কুফরী অবস্থার উপর অভিশাপ; যেমন একজন মুসলমানের উপস্থিত অবস্থা অর্থাৎ ইসলামের কারণেই "তাহার উপর আল্লাহর রহমত হউক" বলা বৈধ মনে করা হয়। অথচ একজন কাফের যেমন মৃত্যুর পূর্বে ইসলাম কবুল করা সম্ভব, অনুরূপভাবে একজন মুসলমানের পক্ষেও তো মৃত্যুর পূর্বে মোরতাদ হওয়া সম্ভব। এই প্রশ্নের জবাব হইল– কোন মুসলমানের জন্য রহমতের দোয়া করার অর্থ হইল, আল্লাহ পাক যেন তাহাকে ইসলামের উপর কায়েম রাখেন– যাহা রহমতের কারণ। কিন্তু কোন কাফেরের জন্য অনুরূপ প্রত্যাশা করা যাইবে না যে, আল্লাহ পাক যেন তাহাকে কুফরীর উপর কায়েম রাখেন– যাহা অভিশাপের কারণ। অর্থাৎ দোয়া হইল প্রার্থনা। আর কুফরী প্রার্থনা করাও কুফরী। অবশ্য এতটুকু বলা বৈধ হইবে যে, অমুক ব্যক্তি যদি কুফরীর উপর মৃত্যুবরণ করে তবে তাহার উপর আল্লাহর অভিশাপ; আর ইসলাম কবুল করিলে অভিশাপ নহে। এই ক্ষেত্রেও বিপদের আশংকা রহিয়াছে। কেননা, এই সন্দেহ তো সততই বিদ্যমান যে, সে ইসলাম কবুল করিবে, না কুফরীতেই জমিয়া থাকিবে। গায়েবের খবর কেবল আল্লাহ পাকই বলিতে পারেন। এই কারণেই কাহারো উপর অভিশাপ না করাই নিরাপদ।

এক্ষণে ভাবিবার বিষয় হইল, কোন কাফেরের উপর অভিশাপ বর্ষণের ক্ষেত্রেই যদি এতসব বিপদাশংকা ও সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক হয়, তবে কোন বেদআতী ও ফাসেকের উপর অভিশাপ বর্ষণের ক্ষেত্রে কি কিছুমাত্র সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক নহে? এই ক্ষেত্রে তো সুনির্দিষ্টভাবে কাহারো নাম লইয়া অভিশাপ দেওয়া কোনক্রমেই উচিৎ নহে। কেননা, মানুষের অবস্থা সকল সময় এক রকম থাকে না। কার অবস্থা কখন কি হয়, কার শেষ পরিণতি কেমন

হইবে, তাহা নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যায় না। ইহা তো কেবল নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে জানিতে পারিতেন যে, অমুক ব্যক্তি কি অবস্থায় ইন্তেকাল করিবে।

সারকথা হইল, কোন ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কে যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সেই ব্যক্তি কুফরী হালাতে ইন্তেকাল করিয়াছে, তবে তাহার উপর অভিশাপ করা জায়েজ হইবে। কিন্তু শর্ত হইল, এই অভিশাপ যেন কোন মুসলমানের জন্য কষ্টের কারণ না হয়।

একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ যাইতেছিলেন। পথে একটি কবর দেখিয়া তিনি হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কবরটি কার? হযরত আবু বকর বলিলেন, ইহা সাঈদ ইবনুল আসের কবর; এই ব্যক্তি বড় গোনাহগার এবং আল্লাহর নবীর অবাধ্য ছিল। এই সময় আমর ইবনে সাঈদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নিজের পিতা সম্পর্কে এহেন মন্তব্য শুনিয়া তিনি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা এমন এক ব্যক্তির কবর, যেই ব্যক্তি আবু বকরের পিতা আবু কোহাফা অপেক্ষা বাহাদুর ও দানশীল ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেখুন, সে আমার সঙ্গে কেমন আচরণ করিতেছে। পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে আমর বিন সাঈদকে নিবৃত্ত করিলেন। সে চলিয়া যাওয়ার পর তিনি হযরত আবু বকরকে বলিলেন, হে আবু বকর! যখন কাফেরদের আলোচনা করিবে, তখন আমভাবে তাহাদের উল্লেখ করিবে। কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম উল্লেখ করিবে না। কেননা, কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলে তাহার সন্তানাদির নিকট ইহা ভাল লাগিবে না এবং তাহারা উত্তেজিত হইয়া উঠিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন নির্দিষ্ট ফাসেকের নাম লইয়া অভিশাপ দেওয়া জায়েয নহে। উহার ফলে ফেৎনা-ফাসাদের আশংকা আছে। অতএব, নির্দিষ্টভাবে কাহারো উপর লা'নত করা ঠিক নহে। বরং উত্তম পন্থা হইল, কোন মানুষকে গোনাহের কাজে লিপ্ত দেখিয়া শয়তানের উপর অভিশাপ দেওয়া। কেননা, শয়তানই মানুষকে গোনাহের কাজে উৎসাহিত করে। আর শয়তানের উপর অভিশাপ করিলে বিপদের কোন আশংকা নাই।

ইয়াজীদের উপর অভিশাপ দেওয়া যাইবে কিনা?

এখন প্রশ্ন হইল, ইয়াজীদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করা যাইবে কি না। ইয়াজীদ সম্পর্কে এমন অভিযোগ আছে যে, তিনি হযরত ইমাম হোসাইনকে

হত্যা করিয়াছেন কিংবা হত্যার নির্দেশ দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হইল– ইয়াজীদ সম্পর্কে এই উভয় অভিযোগই ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নহে। হত্যা বা হত্যার অনুমতি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত এমন মন্তব্য করা ঠিক হইবে না যে, "ইয়াজীদ হযরত ইমাম হোছাইনের ঘাতক"। কেননা, হত্যা করা কবীরা গোনাহ। কোন মুসলমানকে বিনা প্রমাণে কোন কবীরা গোনাহের সহিত সংশ্লিষ্ট করা জায়েজ নহে। যদি সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকে, তবে বলা যাইবে। যেমন এইরূপ বলা যাইবে যে, ইবনে মুলজিম হযরত আলীর হত্যাকারী এবং আবু লু'লুউ হযরত ওমরের হত্যাকারী। কেননা, এই দুইটি ঘটনা ধারাবাহিক বর্ণনায় ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত।

বিনা প্রমাণে কোন মুসলমানকে কাফের ও ফাসেক বলা জায়েয নহে। যেমন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْمِيْ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوْقِ وَلَا يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ اِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهٗ كَذَالِكَ .

অর্থঃ হযরত আবু জর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও ফাসেক অথবা কাফের বলে, আর প্রকৃত পক্ষে সে যদি ফাসেক-কাফের না হইয়া থাকে, তবে মন্তব্যকারীর নিজের উপরই ঐ উক্তি ফিরিয়া আসিবে। (মুসলিম)

হযরত মোয়াজ (রাঃ) বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, আমি তোমাকে কোন মুসলমানকে গালি দিতে এবং ন্যায়পরায়ণ ইমামের নাফরমানী করিতে নিষেধ করিতেছি। (আবু নোয়াইম) সুতরাং কোন মৃতব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলা তো আরো কঠোরভাবেই নিষেধ হইবে।

মাসরূক বলেন, একবার আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে হাজির হইলাম। এই সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অমুক ব্যক্তি কি অবস্থায় আছে, তাহার উপর আল্লাহর লা'নত হউক। আমি আরজ করিলাম, সে তো ইন্তেকাল করিয়াছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, আল্লাহ তাহার উপর রহম করুন। আমি আরজ করিলাম, আপনি তো এই মাত্র তাহার উপর লা'নত করিতেছিলেন, এখন আবার রহমতের দোয়া করিতেছেন, ইহার কারণ কি? জবাবে তিনি বলিলেন, পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ

করিয়াছেনঃ "মুরদারদেরকে গালি দিও না। কেননা, তাহারা নিজেদের কৃতকর্মের নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছে।" (বোখারী)

অন্য রেওয়ায়েতে আছেঃ "মুরদারদিগকে মন্দ বলিও না। উহার ফলে জীবিতদের কষ্ট হয়।" (তিরমিজী)

যাহাই হউক, ইহা প্রমাণিত হইয়া গেল যে, ইমাম হোসাইনের হত্যাকারী হিসাবে ইয়াজীদের উপর অভিশাপ করা জায়েজ নহে। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কাহারো নাম না লইয়া কেবল এইরূপ বলা জায়েজ কি-না যে, "আল্লাহ ইমাম হোসাইনের হত্যাকারীর উপর লা'নত করুন।" উহার জবাব হইল– ইমাম হোসাইনের হত্যাকারীর উপর লা'নত করা জায়েজ বটে। তবে উহার সঙ্গে এই কথা বলিয়া দেওয়া ভাল– "যদি সে তওবা না করিয়া থাকে তবে তাহার উপর আল্লাহর লা'নত হউক"। কেননা, মৃত্যুর পূর্বে সেই হত্যাকারীর তওবা নসীব হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বস্তুতঃ মানুষের উপর অভিশাপ বর্ষণ করার বিষয়টা অত্যন্ত নাজুক। দেখ, ওয়াহশী কাফের থাকা অবস্থায় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত হামজা (রাঃ)-কে শহীদ করিয়াছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তওবা করিয়া তিনি কুফরী হালাতের সমস্ত পাপাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। এখন সেই হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করিয়া হযরত ওয়াহশীর উপর অভিশাপ করা জায়েজ হইবে না। হত্যা করা কবীরা গোনাহ হইলেও হত্যাকারী কাফের হইয়া যায় না। এই কারণেই কোন হত্যাকারীকে অভিশপ্ত বলার পূর্বে দেখিতে হইবে যে, সে তওবা করিয়াছিল কি-না। যদি তওবা করিয়া থাকে, তবে তাহার উপর অভিশাপ করা যাইবে না। কাহারো উপর যদি একান্তই অভিশাপ করিতে হয় তবে উহার সহিত তওবার শর্ত জুড়িয়া দিবে। যেন এই অভিশাপের কারণে নিজেই গোনাহগার হইতে না হয়। অভিশাপ বর্ষণের বিষয়টা যেহেতু এতই জটিল ও নাজুক, সুতরাং এই বিষয়ে নীরব থাকাই নিরাপদ। কেননা, অভিশাপ করা কোন জরুরী বিষয় নহে। কোন কাফেরের উপর অভিশাপ না করিলে গোনাহগার হইতে হইবে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম করিলে গোনাহগার হওয়ার আশংকা রহিয়াছে। সুতরাং এই প্রসঙ্গে নীরব থাকাই উত্তম।

এই প্রসঙ্গটি আমরা এই কারণে আলোচনা করিলাম যে, কাহারো উপর অভিশাপ বর্ষণের ক্ষেত্রে লোকেরা নেহায়েতই অসতর্কতার পরিচয় দিয়া থাকে। অথচ হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে– "মোমেন অভিশাপকারী হয় না।"

সুতরাং মোমেনের কর্তব্য হইল, মানুষের উপর অভিশাপ বর্ষণ পরিহার করিয়া আল্লাহর জিকিরে মশগুল হওয়া। অন্যথায় নীরব থাকা।

সাকী ইবনে ইবরাহীম বলেন, আমরা কতিপয় ব্যক্তি ইবনে আউনের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। লোকেরা বিলাল ইবনে আবী বুরদার সমালোচনা করিয়া তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করিতেছিল। কিন্তু ইবনে আউন এই আলোচনায় অংশ না লইয়া বরাবর নীরব ছিলেন। লোকেরা আরজ করিল, আমরা এই কারণে বিলাল ইবনে আবী বুরদার উপর অভিশাপ করিতেছি যে, সে আপনার সঙ্গে অন্যায় আচরণ করিয়াছিল। অথচ আপনি তাহার উপর অভিশাপ করিতেছেন না, ইহার কারণ কি? জবাবে তিনি বলিলেন, কেয়ামতের দিন আমলনামায় দুইটি বিষয় লেখা থাকিবে। একটি হইল– "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং অপরটি হইল– "অমুকে অমুকের উপর অভিশাপ করিয়াছে"। আমার নিকট ইহাই উত্তম মনে হইতেছে যেন আমার আমলনামায় "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" লেখা থাকে।

এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি এরশাদ করিলেন–

اوصيك أن لا تكون لعانا

"আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, বেশী অভিশাপ দিও না।"

(আহমাদ, তাবরানী)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি অধিক অভিশাপ করে, সে আল্লাহ পাকের নিকট খুবই অপছন্দনীয়। জনৈক বুজুর্গ অভিশাপকে মোমেনের হত্যাকাণ্ডের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই উদ্ধৃতি বর্ণনাকারী হাম্মাদ বিন জায়েদ বলেন, আমি যদি ইহাকে মারফু' হাদীস বলি তবে তাহাতেও কোন ক্ষতি হইবে না। যেমন হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) হইতে এইরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে–

من لعن مؤمنا فهو مثل أن يقتله

অর্থাৎ– যেই ব্যক্তি কোন মোমেনের উপর অভিসম্পাত করে, সে যেন তাহাকে হত্যা করে। (বোখারী, মুসলিম)

কোন মানুষের জন্য বদদোয়া করাও অভিশাপের নিকটবর্তী। কোন জালেমের জন্য এইরূপ বলা জায়েজ নহে যে, আল্লাহ তাহাকে অসুস্থ করিয়া দিন, তাহার রোগ যেন ভাল না হয়, কিংবা আল্লাহ যেন তাহাকে মৃত্যু দেন।

বয়াত ও কবিতা আবৃত্তি

বয়াত ও কবিতা ভালও আছে আবার মন্দও আছে। তবে অনুক্ষণ কবিতার নিমগ্ন হইয়া থাকা ভাল নহে।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

لان يمتلي جوف رجل قيحا يريه خير من ان يمتلي شعرا

অর্থাৎ– মানুষের উদর পুঁজ দ্বারা ভরিয়া পাকস্থলী নষ্ট হইয়া যাওয়া– তাহার উদর বয়াত ও কবিতা দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়া অপেক্ষা উত্তম। (মুসলিম, বোখারী)

একবার মাসরূকের নিকট কেহ একটি বয়াত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বিরক্ত বোধ করিলেন। প্রশ্নকারী আরজ করিল, ইহাতে বিরক্ত হওয়ার কি আছে? তিনি বলিলেন, ইহা আমার পছন্দ নহে যে, আমার আমলনামায় কোন বয়াত উল্লেখ থাকুক।

জনৈক বুজুর্গের নিকট কেহ একটি কবিতা শুনিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "কবিতা বর্জন করিয়া আল্লাহ পাকের জিকির কর।"

অবশ্য শের-বয়াত ও কবিতা রচনা বা আবৃত্তি করা হারাম নহে বটে, তবে এই ক্ষেত্রে সতর্কতা হইল কোন অবস্থাতেই যেন উহাতে শরীয়তের সীমা লংঘন করা না হয়। আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

ان من الشعر لحكمة

অর্থাৎ– "নিঃসন্দেহে কোন কোন বয়াত হেকমতপূর্ণ।"

কবিতা ও বয়াতের মধ্যে সাধারণতঃ মানুষের প্রশংসা ও নিন্দা এবং ক্ষেত্রবিশেষে অবাস্তব ও মিথ্যার সমাবেশ থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও নিন্দা ও প্রশংসা সামগ্রীকভাবে অপছন্দনীয় নহে। স্বয়ং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আনসারী ছাহাবী হযরত হাস্‌সান বিন ছাবেতকে কাফেরদের নিন্দা করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। (বোখারী, মুসলিম)

কাহারো প্রশংসা করিলে যদিও কিছুটা মিথ্যার আশ্রয় লওয়া হয়, তবুও তাহা হারাম নহে। যেমন কাহারো দানশীলতার বর্ণনাচ্ছলে নিম্ন বর্ণিত কবিতায় কিছুটা অসত্যের অভিব্যক্তি থাকিলেও ইহাকে হারাম বলা যাইবে না–

و لم يكن في كفه غير روحه = لجاد بها فليتق الله سائله

অর্থাৎ– "তাহার নিকট যদি রূহ ব্যতীত অন্য কিছু না থাকিত, তবে সে উহাই দান করিয়া দিত। প্রার্থনাকারীর পক্ষেও আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ।"

অর্থাৎ উপরোক্ত পংক্তিতে প্রশংসিত ব্যক্তিটি যদি দানশীল না হইয়া থাকে, তবে এই পংক্তি নিরেট মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। পক্ষান্তরে সেই ব্যক্তি যদি প্রকৃতপক্ষেই দানশীল হইয়া থাকে, তবে এই অতিরঞ্জনকে মোবাহ বলা হইবে। কেননা, এখানে বর্ণিত বিষয়ের হুবহু বাস্তবায়ন উদ্দেশ্য নহে; বরং প্রশংসিত ব্যক্তিটি যে একজন শীর্ষ পর্যায়ের দানশীল এই কথা উল্লেখ করাই এখানে উদ্দেশ্য।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখেও এই জাতীয় কবিতা পাঠ করা হইত এবং তিনি ইহাতে বারণ করেন নাই।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন আমি সুতা কাটিতেছিলাম এবং পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতা সেলাই করিতেছিলেন। হঠাৎ আমি দেখিতে পাইলাম, তাঁহার কপালের ঘর্মবিন্দু সূর্যের আলোকচ্ছটায় উজ্জ্বল তারকার মত ঝলমল করিতেছে। এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমার এই বিস্ময়ভাব দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আয়েশা! তুমি এমন বিস্ময়াবিষ্ট হইলে কেন? আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ললাটের ঘর্মবিন্দু তারকার মত জ্বল জ্বল করিতেছে। আবু বকর হুজলী যদি এই মুহূর্তে আপনাকে দেখিতে পাইত, তবে সে নিশ্চিতভাবেই জানিতে পারিত যে, আপনিই তাহার কবিতার মূর্তপ্রতীক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কবিতাটি কি? আমি আরজ করিলাম, তাহার কবিতা এই–

و مبرأ من كل غبر حيضة = و فساد مرضعة و داء مغيل

و إذا نظرت الى اسرة وجهه = برقت كبرق العارض المتهلل

অর্থঃ সে হায়েজের অপরিচ্ছন্নতা, দুধমাতার ভ্রষ্টতা এবং যাবতীয় ব্যাধি হইতে পবিত্র। যখন আমি তাহার মুখমণ্ডলের দিকে তাকাই, তখন মনে হয় যেন মেঘমালায় বিদ্যুৎ চমকাইতেছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার মুখে এই পংক্তি শুনিয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের কাজ রাখিয়া দিলেন এবং নিকটে আসিয়া আমার ললাটে চুম্বন আঁকিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন–

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا يَا عَائِشَةُ مَا سُرِرْتِ مِنِّيْ كَسُرُوْرِيْ مِنْكِ

অর্থঃ হে আয়েশা! আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তুমি হয়ত আমার উপর এতটা খুশী হও নাই; যতটা আমি তোমার উপর হইয়াছি। (বায়হাকী)

হোনাইনের যুদ্ধের পর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদদের মধ্যে গনীমতের মাল বণ্টন করিলেন এবং আব্বাস বিন মারওয়ানকে চারটি উট দিলেন। তিনি যেহেতু অন্যদের তুলনায় কম পাইয়াছিলেন এই কারণে তিনি একটি কবিতার মাধ্যমে উহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিলেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামকে বলিলেন, তাহার অভিযোগ মিটাইয়া দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দাও। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং একশত উট দেওয়ার পর তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এখনো সে কবিতা বলে কি? হযরত আব্বাস বিন মারওয়ান এইবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কোরবান হউক। কবিতা যখন আমার জিহ্বায় পিপড়ার মত দংশন করিতে থাকে, তখন আমি কিছু না বলিয়া থাকিতে পারি না। আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হাস্য করিয়া ফরমাইলেন– যত দিন উট চেচামেচী করিবে, আরবগণ কবিতা বলা ত্যাগ করিবে না।

হাসি মজাক

হাসি-মজাক করাও অপছন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। তবে স্বল্প মাত্রায় করিলে তাহাতে কোন দোষ নাই। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

لا تمار اخاك و لا تمازحه

অর্থাৎ– "নিজের ভাইয়ের কথার মধ্যে কথা বলিও না এবং তাহার সঙ্গে ঠাট্টা করিও না।"

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কথার মধ্যে কথা বলিলে প্রতিপক্ষকে অপমান করা হয় এবং উহার ফলে সে মনে কষ্ট পায়। সুতরাং ইহা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ বোধগম্য। কিন্তু হাসি মজাকের মধ্যে তো কাহাকেও অপমান করা বা কষ্ট দেওয়া হয় না। বরং ইহার ফলে তো অন্তরে প্রফুল্লতা আসে। ইহা

নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ কি? এই প্রশ্নের জবাব হইল– হাসিমজাকে সাধারণতঃ অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি হইয়া থাকে এবং উহার ফলে মন সর্বদা খেল-তামাশার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। খেলাধুলা মোবাহ হইলেও অনুক্ষণ উহাতে লিপ্ত থাকা নিষিদ্ধ। খেলতামাশায় বাড়াবাড়ি করিলে অতিরিক্ত হাসি আসে এবং এই অতিরিক্ত হাসির ফলে দিল মরিয়া যায়। মানুষের নিকট নিজের গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায় এবং অন্তরে ঘৃণা পয়দা হয়। অবশ্য হাসির মধ্যে যদি এইসব অনিষ্ট না থাকে তবে হাসি নিন্দনীয় নহে।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন– "আমিও হাসি-ঠাট্টা করি, কিন্তু তখনও সত্য ছাড়া মিথ্যা বলি না।"

অবশ্য ইহা কেবল নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, হাসিমজাকের সময়ও তাঁহার পবিত্র জবান হইতে কেবল সত্য কথাই বাহির হইত। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে চাই তিনি যত বড় পরহেজগারই হউন; হাসিমজাকের সময় নিজের জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় না।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি অতিরিক্ত হাসাহাসি করে, তাহার ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব বিনষ্ট হয়। যে মানুষের সঙ্গে ফুর্তি করিয়া বেড়ায়, মানুষ তাহাকে সম্মানের নজরে দেখে না। মানুষ যখন কোন একটি কাজ বেশী বেশী করে, তখন সে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া খ্যাতি লাভ করে। যে বেশী কথা বলে, সে বেশী ভুল করে। যে বেশী ভুল করে, তাহার লজ্জা-শরম লোপ পায়। যার লজ্জা-শরম হ্রাস পায়, তাহার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে না, তাহার অন্তর মরিয়া যায়। তাছাড়া অতিরিক্ত হাসির কারণে মানুষ আখেরাত হইতে গাফেল হইয়া যায়।

পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا و لضحكتم قليلا

অর্থাৎ– "আমি যাহা জানি, তাহা যদি তোমরা জানিতে, তবে অধিক ক্রন্দন করিতে এবং কম হাসিতে।"

এক ব্যক্তি তাহার ভাইকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি ইহা জানা আছে যে, একদিন তোমাকে দোজখে যাইতে হইবে। সে বলিল, হাঁ! আমার ইহা জানা আছে। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি ইহাও জানা আছে, দোজখ হইতে বাহির হইতে পারিবে কিনা। সে বলিল, এই বিষয়ে আমার কিছুই জানা নাই। এইবার লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তবে কেমন করিয়া তুমি

এত হাসিতেছ? এই ঘটনার পর হইতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেই লোকটিকে আর কখনো হাসিতে দেখা যায় নাই।

ইউসুফ ইবনে এছবাত বলেন, হযরত হাসান বসরী (রহঃ) সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত হাসেন নাই। হযরত আতায়ে ছালামী সম্পর্কে কথিত আছে যে, ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর তিনি কাহারো সঙ্গে হাসেন নাই।

ওয়াহায়ব ইবনে ওয়ারদ ঈদুল ফিতরের দিন কতিপয় ব্যক্তিকে হাসাহাসি করিতে দেখিয়া বলিলেন, ইহাদিগকে যদি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, তবে ইহা শোকরকারীদের কাজ নহে। আর ক্ষমা না হইয়া থাকিলে ইহা ভীতদের কাজ নহে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন য়া'লা (রাঃ) কাহাকেও হাসিতে দেখিলে বলিতেন, মিয়া! তুমি হাসিতেছ? এমনও হইতে পারে যে, তোমার কাফনের কাপড় ধৌত করিয়া প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে (অর্থাৎ তোমার মৃত্যু একেবারেই নিকটবর্তী)। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি গোনাহ করিবার পর হাসে সে ক্রন্দনরত অবস্থায় জাহান্নামে যাইবে।

মোহাম্মদ বিন ওয়াসে' এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জান্নাতের মধ্যে কাহাকেও ক্রন্দন করিতে দেখিলে তুমি কি বিস্মিত হইবে না? সে বলিল, অবশ্যই হইব। কেননা, জান্নাত তো ক্রন্দন করার জায়গা নহে। এইবার তিনি বলিলেন, ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্মিত হওয়া উচিত সেই ব্যক্তির উপর, যেই ব্যক্তি দুনিয়াতে হাসে। কেননা, দুনিয়া হাসার জায়গা নহে।

এখানে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, অট্টহাসি বা জোরে শব্দ করিয়া হাসা নিন্দনীয়। কিন্তু মুচকি হাসি বা যেই হাসিতে কোন শব্দ হয় না তাহা নিন্দনীয় নহে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ নীরবে মৃদু হাস্য করিতেন।

হযরত কাসেম বর্ণনা করেন, একবার এক আরব বেদুঈন লাল উটের উপর সওয়ার হইয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। লোকটি পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ছালাম আরজ করিয়া তাঁহার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্যে সামনে আগাইতে চাহিবামাত্র তাহার উট উত্তেজিত হইয়া তাহাকে তাড়া করিত। উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম এই দৃশ্য দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। অবশেষে লোকটি কিছুতেই তাহার উটকে নিয়ন্ত্রণে আনিতে পারিল না এবং এক পর্যায়ে মাটিতে

পড়িয়া গিয়া সে মৃত্যুবরণ করিল। ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, উটটি উহার আরোহীকে মাটিতে ফেলিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে তো মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার রক্ত তোমাদের মুখে লাগিয়া আছে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, যে অতিরিক্ত হাস্য করে, সে মানুষের নিকট হালকা হইয়া যায়। মোহাম্মদ বিন মুনকাদির (রহঃ) বলেন, একবার আমার মাতা আমাকে উপদেশ দিয়া বলিলেন, বৎস! ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাসাহাসি করিও না। এইরূপ করিলে তাহারা তোমাকে সম্মান করিবে না।

একবার হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রাঃ) নিজের ছেলেকে নসীহত করিয়া বলিলেন, বেটা! শরীফ ও সম্মানী লোকদের সম্মুখে কখনো হাসিও না। কেননা এইরূপ করিলে তাহারা তোমাকে ঘৃণা করিবেন। আর নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকদের সঙ্গেও হাসাহাসি করিও না। উহার ফলে তাহাদের অন্তরে তোমার আজমত ও ভয় কমিয়া যাইবে।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) বলেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং হাসিমজাক পরিহার কর। কেননা, হাসিঠাট্টা করিলে অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ পয়দা হয় এবং উহা মানুষকে মন্দের দিকে লইয়া যায়। কোরআন শরীফকে নিজেদের আলোচ্য বিষয় বানাও এবং উহার জন্য মজলিস কায়েম কর।

ইহা সম্ভব না হইলে অন্ততঃ ভাল কথা বল এবং নেক লোকদের আলোচনা কর।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, হাসিঠাট্টা মানুষকে হক ও সত্য হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। জনৈক বুজুর্গ বলেন, প্রত্যেক বিষয়ের একটা পরিণতি আছে। হাসি-মজাকের পরিণতি হইল শত্রুতা। অন্য এক বুজুর্গ বলেন, হাসিঠাট্টার ফলে মানুষের বুদ্ধি-বিবেক লোপ পায় এবং বন্ধুজন পৃথক হইয়া যায়।

রাসূল (সঃ)-এর আনন্দ কৌতুক

পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন সময় ছাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে আনন্দ-কৌতুক করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁহার পবিত্র আনন্দ-কৌতুককে আমাদের হাসি-ঠাট্টার সঙ্গে কেয়াস করা ঠিক হইবে না। কোন ব্যক্তি যদি সত্যিকার অর্থেই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ হাসি-মজাক করিতে সক্ষম হয়, তবে নিঃসন্দেহে তাহা নিন্দনীয় কিংবা অপছন্দনীয় হইবে না। বরং এক হিসাবে তাহা সুন্নত ও মোস্তাহাবই হইবে।

আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আনন্দ-কৌতুকে কোনরূপ অসত্য ও অতিরঞ্জনের লেশমাত্র যুক্ত হইত না। উহাতে এমন কোন বিষয়ও থাকিত না যাহা অপরের জন্য কষ্টের কারণ হইতে পারে। আর তিনি খুব কমই হাসি-ঠাট্টা করিয়াছেন। এখন কোন ব্যক্তি যদি এইসব রীতি ও শর্ত পূরণ করিয়া হাসি-ঠাট্টা করিতে পারে, তবে তাহার জন্য উহার অনুমতি আছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হইল, আজকাল অনেকেই হাসি-মজাককে নিয়মিত পেশায় পরিণত করিয়া দিনরাত উহাতেই ডুবিয়া থাকে। আর মনে করে যে, এই ক্ষেত্রে আমি আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ করিতেছি। এইসব ধারণা নিতান্ত মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নহে। নিম্নে আমরা প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আনন্দ-কৌতুকের কিছু নমুনা উল্লেখ করিতেছি–

০ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও তো আমাদের সঙ্গে আনন্দ-কৌতুক করেন। জবাবে তিনি এরশাদ করিলেনঃ নিঃসন্দেহে আমি (কৌতুকের সময়ও) সত্যই বলিয়া থাকি। (তিরমিজী)

০ একদা এক বৃদ্ধা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দোয়া করুন, যেন আমি বেহেশতে যাইতে পারি। বৃদ্ধার নিবেদনের জবাবে আল্লাহর নবী এরশাদ করিলেন– "কোন বৃদ্ধা নারী বেহেশতে যাইতে পারিবে না।" আল্লাহর নবীর মুখে এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা অন্তহীন মর্মপীড়ায় রোদন করিতে করিতে তথা হইতে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরামকে বলিলেন, তোমরা গিয়া তাহাকে বল, (আমার কথার অর্থ ইহা নহে যে, দুনিয়াতে যেই সকল নারী বৃদ্ধা হইয়াছে, পরকালে তাহারা বেহেশতে যাইতে পরিবে না। বরং) আমার কথার অর্থ হইল, বৃদ্ধারাও জান্নাতে যাইবে বটে, তবে যুবতী হইয়া যাইবে। অতঃপর তিনি কালামে পাকের নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন–

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً . فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا .

অর্থঃ "আমি জান্নাতী রমনীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তাহাদিগকে করিয়াছি চির কুমারী।" (সূরা সূরা ওয়াক্কেয়া - ৩৫ আয়াত)

অর্থাৎ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত মন্তব্যের অর্থ

হইল, বৃদ্ধা রমণীগণকে চিরকুমারী বানাইয়া বেহেশতে প্রবেশ করানো হইবে।

○ জায়েদ ইবনে আসলাম বর্ণনা করেন, উম্মে আয়মন নাম্নী এক মহিলা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আপনাকে দাওয়াত করিয়াছেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার স্বামী কি সেই ব্যক্তি, যার চোখে ধবল (সাদা দাগ) রহিয়াছে। উম্মে আয়মন বলিল, আল্লাহর কসম! আমার স্বামীর চোখে কোন ধবল নাই। এইবার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এমন কোন মানুষ নাই, যাহার চোখে ধবল (সাদা দাগ) নাই। (অর্থাৎ তিনি চোখের কাল মনির চতুর্দিকের সাদা অংশের কথা বলিয়াছেন।

○ হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু তালহা (রাঃ)-এর এক ছেলের নাম ছিল ওমায়ের। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আবু তালহা (রাঃ)-এর ঘরে তাশরীফ আনিতেন, তখন তাহার ছেলেকে ডাকিয়া বলিতেন, ওহে ওমায়ের! কোথায় গেল তোমার নোগায়ের?

"নোগায়ের" লাল ঠোটবিশিষ্ট একটি পাখীর নাম। হযরত আবু তালহার ছেলের একটি নোগায়ের ছিল। সে ঐ পাখীটি লইয়া খেলা করিত। কিছু দিন পর উহা মরিয়া গেলে পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবিতার ভাষায় ওমায়েরকে তাহার নোগায়ের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন।

○ একবার নবীজী (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। এই প্রতিযোগিতায় হযরত আয়েশা (রাঃ) অগ্রগামী হন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তখন হালকা-পাতলা ছিলেন। বয়স বৃদ্ধির পর হযরত আয়েশার দেহ ভারী হইয়া গেলে তাঁহাদের আবার সেই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং উহাতে হযরত আয়েশা (রাঃ) পরাজিত হন।

○ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হারীরা (গোশত সহযোগে প্রস্তুত এক প্রকার রান্না করা খাবার) তৈরী করিলাম। হযরত সাওদা (রাঃ)-ও ঘরে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাহাকেও খাইতে বলিলাম কিন্তু তিনি বলিলেন, "আমি খাইব না।" আমি বলিলাম, তুমি যদি না খাও, তবে এই খাবার আমি তোমার চেহারায় মাখিয়া দিব। উহার পরও তিনি খাইতে অস্বীকার করিলে আমি সত্য সত্যই উহা তাহার চেহারায় মাখিয়া দিলাম। অতঃপর উহার বদলা হিসাবে হযরত সওদাও ঐ খাবার আমার মুখে মাখিয়া দিলেন। আমাদের এই কাণ্ড দেখিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিয়া ফেলিলেন।

০ হযরত জাহহাক বিন সুফিয়ান কেলাবীর চেহারা-ছুরত ছিল খুবই বিশ্রী। একবার তিনি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহার নিকট বাইআত হইলেন। এই সময় সেখানে হযরত আয়েশাও (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাটি ছিল পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বের।

হযরত জাহ্হাক বিন সুফিয়ান কেলাবী নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দুইজন স্ত্রী আছে, তাহারা উভয়ই এই আয়েশা অপেক্ষা অধিক সুন্দরী। আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আমি তাহাদের একজনকে ত্যাগ করিতেছি; আপনি তাহাকে গ্রহণ করুন। হযরত আয়েশা (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করিলেন, তাহারা বেশী সুন্দরী, না তুমি বেশী সুন্দর? হযরত কেলাবী বলিলেন, আমিই বেশী সুন্দর। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশার প্রশ্ন এবং জাহ্হাক বিন সুফিয়ানের জবাব শুনিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। কেননা, হযরত জাহ্হাক (রাঃ) নেহায়েত বদ-ছুরত হওয়ার পরও নিজেকে সুন্দর বলিয়া উল্লেখ করিতেছিলেন।

০ হযরত আলকামা আবু ছালামা হইতে নকল করেন, একবার পেয়ারা নবী হযরত হাসানকে নিজের জিহবা মোবারক দেখাইয়া দেখাইয়া হাসাইতেছিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া উইয়াইনা বিন বদর আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ছেলেরা বড় হইয়া তাহাদের মুখে দাড়িও উঠিয়া যায়, কিন্তু আমি কোন দিন তাহাদিগকে আদর করি না। প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন–

من لا يرحم لا يرحم

"যে দয়া করে না, তাহার উপর দয়া করা হয় না।"

০ একবার হযরত ছোহাইব (রাঃ)-এর চক্ষুপীড়া দেখা দেয়। এই অবস্থায় একদিন তিনি খেজুর খাইতে থাকিলে পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, ছোহাইব! চক্ষুপীড়া লইয়া তুমি খেজুর খাইতেছ? হযরত ছোহাইব জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অন্য মাড়ির দাঁত দিয়া খাইতেছি। প্রিয় সহচরের এই নির্দোষ কৌতুকে আল্লাহর রাসূল এমনভাবে হাস্য করিলেন যে, তাঁহার দন্তপাটি প্রকাশ হইয়া পড়িল। (ইবনে মাজা)

০ খাওয়াত বিন জোবায়ের একবার মক্কার পথে বনু কাবের কতক মহিলার সঙ্গে বসিয়া ছিলেন। ইত্যবসরে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পথে যাওয়ার সময় তাহাকে সেখানে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি

এখানে বসিয়া কি করিতেছ? তিনি আরজ করিলেন, আমার উট অবাধ্যতা করিতেছে, এই কারণে আমি এই মহিলাদের দ্বারা রশি পাকাইতেছি। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পুনরায় সেই পথে প্রত্যাবর্তন করিলেন, খাওয়াত বিন জোবায়ের তখনো সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। এইবার আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! তোমার উটকি এখনো অবাধ্যতা ত্যাগ করে নাই? খাওয়াত বলেন, আল্লাহর নবীর এই প্রশ্ন শুনিয়া আমি লজ্জায় একেবারে নীরব হইয়া গেলাম।

উপরোক্ত ঘটনার পর যখনই আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিতাম, লজ্জার কারণে পাশ কাটিয়া অন্য দিকে সরিয়া যাইতাম। পরে আমি মদীনা শরীফ গমনপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলাম। এক দিন আমি মসজিদে নামাজ পড়িতেছিলাম, এমন সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় তাশরীফ আনিলেন। আমি নামাজ দীর্ঘ করিতে চাহিতেছিলাম, কিন্তু তিনি বলিলেন, নামাজ দীর্ঘ করিও না, আমি তোমার অপেক্ষায় আছি। আমি নামাজ শেষ করিবার পর তিনি আমাকে বলিলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! তোমার উট কি অবাধ্যতা ত্যাগ করে নাই? আল্লাহর নবীর মুখে এই কথা শুনিয়া আমি এতটা শরমিন্দা হইলাম যে, অতঃপর আমার মুখে উহার কোন উত্তর যোগাইল না এবং আমি তাঁহার সম্মুখ হইতে পালাইয়া গেলাম।

পরে একদিন আমি এমন অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে পতিত হইলাম যে, তিনি একটি গাধার উপর সওয়ার ছিলেন এবং তাঁহার উভয় পা গাধার এক দিকে রেকাবের উপর ছিল। আমাকে দেখিয়া তিনি সেই আগের মতই প্রশ্ন করিলে আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, তখন হইতেই আমার উট অবাধ্যতা ত্যাগ করিয়াছে। আমার এই জবাব শুনিয়া তিনি এরশাদ করিলেনঃ আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!! আয় আল্লাহ, এই ব্যক্তিকে হেদায়েত দান কর।

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ পাক তাহাকে ইসলামের সৌন্দর্য দ্বারা ধন্য করিয়াছেন এবং হেদায়েতের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। (তাবরানী কাবীর)

০ মদীনায় নাঈ'মান নামে একজন কৌতুক-প্রিয় আনসারী ছিলেন। এক সময় তিনি শরাব পান করিতেন এবং এই কারণে তাহাকে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া আসিলে তিনি তাহাকে জুতা দিয়া প্রহার করিতেন। কোন কোন সময় ছাহাবায়ে কেরামও তাহাকে জুতা দিয়া প্রহার করিতেন। একদিন এক ছাহাবী তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,

আল্লাহ তোমার উপর লা'নত করুন। এই কথা শুনিয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ছাহাবীকে বলিলেন, তাহার উপর লা'নত করিও না। সে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে মোহাব্বত করে।

আল্লাহর রাসূলের প্রতি উপরোক্ত আনসারী ছাহাবীর মোহাব্বতের এমন অবস্থা ছিল যে, মদীনার বাজারে বিক্রয়ের জন্য কোন খাদ্য দ্রব্য আসিলে তিনি উহা (বাকীতে) ক্রয় করিয়া বলিতেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহা আমার পক্ষ হইতে আপনাকে হাদিয়া। পরে সেই দ্রব্যের বিক্রেতা মূল্য চাহিতে আসিলে তিনি তাহাকে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া আসিয়া বলিতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করিয়া দিন। আল্লাহর নবী বলিতেন, উহা তো তুমি আমাকে হাদিয়া দিয়াছিলে, (এখন আবার মূল্য পরিশোধের জন্য তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিয়াছ কেন?) ছাহাবী আরজ করিতেন, হুজুর! তখন আমার নিকট কোন অর্থ ছিল না। অথচ আমার মন চাহিতেছিল যেন উহা আপনাকে খাওয়াইতে পারি। আল্লাহর হাবীব (প্রিয় সহচরের অন্তহীন ভালবাসার অবস্থা দেখিয়া) মৃদু হাস্য করতঃ উহার মূল্য পরিশোধ করাইয়া দিতেন।

এই হইল আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দোষ আনন্দ-কৌতুকের অবস্থা। এইরূপ নির্দোষ হাসি-মজাক মোবাহ। কিন্তু ক্রমাগত উহাতে নিমগ্ন হওয়া ভাল নহে।

উপহাস করা

মানুষকে উপহাস ও বিদ্রূপ করা ইহা সর্বতোভাবেই নিন্দনীয় কর্ম। কেননা, উহার ফলে মানুষের কষ্ট হয়। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ *

অর্থঃ হে মোমেনগণ! কেহ যেন অপর কাহাকেও উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। (সূরা হুজুরাত - ১১ আয়াত)

উপহাসের অর্থ হইতেছে, কাহাকেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা বা অপমান করার উদ্দেশ্যে তাহার দোষ-ত্রুটি এমনভাবে বর্ণনা করা যাহা দেখিলে মানুষের হাসি-পায়। এই উপহাস কথায়, ইশারা-ইঙ্গিতে কিংবা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাজের

অনুকরণ দ্বারাও হইতে পারে। সামনা সামনি হইলে তাহা উপহাস; আর এই উপহাসই যদি কাহারো অগোচরে করা হয়; তবে তাহা গীবত। উপহাস গীবত না হইলেও উহা গীবতের চাইতে কমও নহে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার আমি এক ব্যক্তির কোন কাজের অনুকরণ করিলে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন–

و الله ما احب ان حاكيت انسانا و لي كذا كذا

অর্থ ঃ "অনেক কিছুর বিনিময়েও আমি কোন মানুষের অনুকরণ করা পছন্দ করি না।" (আবু দাউদ, তিরমিজী)

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا

অর্থঃ হায় আফসোস, ইহা কেমন আমলনামা! ইহা তো ছোট-বড় কোন কিছুই বাদ দেয় নাই। (সূরা কাহাফ - ৪৯ আয়াত)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ছগীরা অর্থ হইতেছে কোন মোমেনের উপহাসে মুচকি হাসা এবং কবীরা অর্থ হইল কোন মোমেনের উপহাসে অট্টহাসি করা বা জোরে হাসা।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর উপরোক্ত তাফসীর দ্বারা জানা গেল যে, কোন মুসলমানকে লইয়া উপহাস-বিদ্রূপ করা এবং তাহার কোন দোষ-ত্রুটির উপর হাসাহাসি করা গোনাহের মধ্যে গণ্য। হযরত আব্দুল্লাহ বিন জামআ' (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক বয়ানের সময় এমন কতিপয় ব্যক্তিকে নসীহত করিতে শুনিয়াছি, যাহারা অপর এক ব্যক্তি কর্তৃক স্বশব্দে বায়ু ত্যাগ করার কারণে হাসিয়াছিল। তিনি এরশাদ করিয়াছেন–

علام يضحك احدكم مما يفعل

অর্থাৎ– "তোমরা এমন বিষয়ের উপর কেন হাস, যেই বিষয়ে তোমরা নিজেরাও লিপ্ত।" (বোখারী, মুসলিম)

এক রেওয়ায়েতে সেই সকল ব্যক্তির পরিণতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহারা দুনিয়াতে মানুষকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। বলা হইয়াছে– দুনিয়াতে যাহারা মানুষকে লইয়া উপহাস-বিদ্রূপ করিত, পরকালে তাহাদের জন্য বেহেশতের একটি দরজা খুলিয়া দিয়া বলা হইবে, ভিতরে আস। তাহারা

নিজেদের বিপদ-মুসীবতসহ দরজার নিকট আসিবা মাত্র তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর অন্য এক দরজায় তাহাদিগকে আহবান করা হইবে। তাহারা সেই আগের মত দরজার নিকট আসিবার পর দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এইভাবে বার বার পেরেশান হইবার পর এক পর্যায়ে তাহাদিগকে জান্নাতের দরজায় ডাকা হইবে কিন্তু তাহারা আর সেই ডাকে সাড়া দিবে না।

হযরত মোআজ বিন জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

مَنْ عَيَّرَ اَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَعْمَلَهُ

অর্থাৎ– "যেই ব্যক্তি কোন (মুসলমান) ভাইকে তাহার কোন গোনাহের কারণে খোঁটা দিবে, তাহার মৃত্যু আসিবে না যাবৎ সে নিজে ঐ গোনাহের মধ্যে লিপ্ত না হয়।" (তিরমিজী)

এইসব বিবরণের সারমর্ম হইল, কোন মানুষকে উপহাস-বিদ্রূপ ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা এবং কাহাকেও অপ্রস্তুত করা জায়েজ নহে। উপস্থাপিত আয়াতে উহার কারণও নির্দেশ করা হইয়াছে যে, "সেই ব্যক্তি উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে।" অর্থাৎ যেই ব্যক্তিকে তুমি হীন মনে করিয়া উপহাস করিতেছ সেই ব্যক্তি তোমার তুলনায় উত্তমও হইতে পারে। কোন মানুষকে লইয়া উপহাস ও হাসাহাসি করিলে যদি সে কষ্ট পায়, তবে এইরূপ হাসাহাসি নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে সেই ব্যক্তি যদি খুশী হয় তবে উহাকে উপহাস না বলিয়া 'ঠাট্টা' বলিতে হইবে। ইহার বিধান ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

গোপন কথা ফাঁস করা

কাহারো এমন বিষয় ফাঁস করিয়া দেওয়া নিষিদ্ধ, যাহা সে গোপন রাখিতে চাহে। কেননা, উহার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কষ্ট হয় এবং বন্ধুত্বের হক নষ্ট হয়। রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي امانة

অর্থঃ "কোন মানুষ কথা বলার পর যদি আড় চোখে তাকায়, তবে তাহার সেই কথা আমানত হইয়া যায়।" (আবু দাউদ, তিরমিজী)

এক হাদীসে আছে–

الحديث بينكم امانة

অর্থাৎ, "তোমাদের পারস্পরিক আলোচনা আমানত।" (ইবনে আবিদ্দুন্য়া)

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, কোন ভাইয়ের গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া– ইহাও খেয়ানতের মধ্যে গণ্য। বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) ওলীদ বিন ওতবার নিকট কোন গোপন বিষয় বলিলেন। পরে ওতবা নিজের পিতার নিকট গিয়া বলিলেন, আব্বাজান! আজ আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) আমার নিকট একটি গোপন বিষয় বলিয়াছেন। এখন সেই বিষয়টি আমি আপনার নিকট প্রকাশ করিতে চাহিতেছি। ওতবা বলিলেন, আমার নিকট তাহা কি কারণে প্রকাশ করিবে? কেননা, মানুষ যতক্ষণ কোন তথ্য গোপন রাখে, ততক্ষণ উহা তাহার নিয়ন্ত্রণে থাকে। অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া দিবার পর উহার উপর আর তাহার নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ওলীদ বলিলেন, পিতা-পুত্রের মধ্যেও কি এইরূপ হয়? ওতবা বলিলেন, পিতা-পুত্রের মধ্যে এইরূপ হয় না বটে, কিন্তু আমি চাই যেন গোপন কথা ফাঁস করিয়া দেওয়ার অভ্যাস তোমার না হয়।

পরে হযরত ওলীদ বিন ওতবা আমীর মোয়াবিয়ার নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, তোমার পিতা তোমাকে একটি অপরাধের গোলামী হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

সারকথা হইল, কাহারো কোন গোপন বিষয় ফাঁস করিয়া দেওয়া খেয়ানত। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ইহা হারাম। আর ইহার ফলে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত নাও হয়, তবুও ইহা নীচতা।

মিথ্যা ওয়াদা

মানুষের জিহবা খুব দ্রুত ওয়াদা করিয়া ফেলে বটে, কিন্তু উহা পূরণ করার ক্ষেত্রে বেশ অবহেলা করিয়া থাকে। ইহা সুস্পষ্টভাবেই ওয়াদা খেলাফী এবং ইহা মোনাফেকীর আলামত।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

অর্থঃ "মোমেনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।" (সূরা মায়িদা - ১ আয়াত)

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ ওয়াদা করা দানের মধ্যে গণ্য। তো দান যেমন ফেরৎ লওয়া যায় না, তদ্রূপ ওয়াদা করার পর আর উহার খেলাফ করা যায় না। তিনি আরো এরশাদ করিয়াছেনঃ ওয়াদা করাও এক প্রকার কর্জ।

ওয়াদা পূরণ করার ব্যাপারে হযরত ইসমাঈল (আঃ) খুবই যত্নবান ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁহার এই সিফাতটিকে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ

–"তিনি ছিলেন ওয়াদায় পাকা।"

এই প্রসঙ্গে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হইল– একবার তিনি এক ব্যক্তির সঙ্গে কোথাও সাক্ষাতের ওয়াদা করেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি ইহা ভুলিয়া গিয়াছিল। হযরত ইসমাঈল (আঃ) লোকটির জন্য সেই নির্দিষ্ট স্থানে ক্রমাগত বাইশ দিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যু নিকটবর্তী হইলে তিনি উপস্থিত লোকজনকে বলিলেন, কোরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি আমার মেয়েকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়াছিল এবং আমিও তাহার সঙ্গে নিমরাজী ওয়াদা করিয়াছিলাম। আল্লাহর শপথ! আমি এক তৃতীয়াংশ মোনাফেকী লইয়া আল্লাহর দরবারে হাজির হইব না। সুতরাং তোমরা সাক্ষী থাকিও, আমি আমার মেয়েকে সেই ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ দিয়া গেলাম।

এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, নবুওয়্যতের পূর্বে আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে কিছু ক্রয় করিবার পর উহার কিছু মূল্য বাকী ছিল এবং আমি তাঁহার নিকট আরজ করিয়াছিলাম, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি অবশিষ্ট মূল্য লইয়া আসিতেছি। কিন্তু তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর সেই দিন আমি মূল্য পরিশোধ করার কথা ভুলিয়া গেলাম এবং পরের দিনও আমার সেই কথা স্মরণ হইল না। তৃতীয় দিন আমি সেখানে গিয়া দেখিতে পাইলাম, তিনি সেই স্থানে ঠায় অপেক্ষা করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, ভাই! তুমি তো আমাকে বেশ বিপদে ফেলিয়া দিলে। তিন দিন যাবত আমি এখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। (আবু দাউদ)

একবার হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কোন ব্যক্তি যদি কাহারো সঙ্গে সাক্ষাতের ওয়াদা করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথায় উপস্থিত না হয়, তবে সেই ব্যক্তির জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করা বিধেয়? তিনি বলিলেন, পরবর্তী নামাজের সময় আসা পর্যন্ত।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) কাহারো সঙ্গে কোন বিষয়ে ওয়াদা করিলে "ইনশাআল্লাহ" শব্দ অবশ্যই ব্যবহার করিতেন। ইহাই উত্তম। ওয়াদা করার সময় যদি উহা পূরণ করার পাক্কা এরাদা থাকে, তবে উহা পূরণ করা

জরুরী। অবশ্য সঙ্গত কোন ওজর থাকিলে তাহা ভিন্ন কথা। আর ওয়াদা করার সময়ই যদি এমন নিয়ত থাকে যে, "তাহা পূরণ করিব না।" তবে ইহা মোনাফেকীর মধ্যে গণ্য হইবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ যেই ব্যক্তির মধ্যে তিনটি অভ্যাস পাওয়া যাইবে, সে মোনাফেক– যদিও সে নামাজ-রোজা আদায় করে এবং নিজেকে মুসলমান বলিয়া দাবী করে। সেই তিনটি অভ্যাস হইল– (১) কথা বলার সময় মিথ্যা বলা। (২) ওয়াদা করিয়া তাহা পূরণ না করা এবং (৩) আমানত রাখা হইলে উহাতে খেয়ানত করা। (বোখারী, মুসলিম)

ওয়াদা ভঙ্গ প্রসঙ্গে উপরে যেই ক্ষতির কথা বলা হইল, তাহা সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যেই ব্যক্তি ওয়াদা করা সত্ত্বেও তাহা পূরণ করার ইচ্ছা পোষণ না করিবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি ওয়াদা করার সময় তাহা পূরণ করার পাক্কা এরাদা করার পরও কোন সঙ্গত ওজরের কারণ তাহা পূরণ করিতে না পারে, তবে সে ঐ ক্ষতির শিকার হইবে না এবং তাহাকে মোনাফেকও বলা হইবে না– যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাহা মোনাফেকী কর্ম বলিয়া মনে হয়।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আবু হায়সামকে একজন গোলাম দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছিলেন। এই সময় গনীমতের মালে তিনজন গোলাম আসে। দুইজনকে বণ্টন করিয়া দেওয়ার পর একজন তাঁহার নিকট অবশিষ্ট ছিল। ইত্যবসরে হযরত ফাতেমা (রাঃ) পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিলেন, যাঁতা পিষিতে পিষিতে আমার হাতে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছে; এই গোলামটি আমাকে দান করুন। এই সময় আবুল হায়সামের সঙ্গে কৃত ওয়াদার কথা মনে পড়িলে তিনি আদরের কন্যাকে বলিলেন, এখন তোমাকে গোলাম দিলে আমার ওয়াদা ভঙ্গ হইবে। অতঃপর তিনি আবুল হায়সামকেই সেই গোলাম দান করিলেন।

ওয়াদা খেলাফীর সংজ্ঞা উল্লেখ করিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ মানুষ যখন কাহারো সঙ্গে ওয়াদা করে এবং এই নিয়তও করে যে, সেই ওয়াদা সে পূরণ করিবে, অতঃপর যদি কোন কারণে তাহা পূরণ করিতে না পারে; তবে তাহার কোন গোনাহ হইবে না।

মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা শপথ করা

মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা শপথ করা নিকৃষ্ট পর্যায়ের অপরাধ এবং

মহাপাপ। ইসমাঈল ইবনে ওয়াসেত বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর একটি বয়ান শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেনঃ আমি এখন যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, হিজরতের প্রথম বৎসর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে দাঁড়াইয়া .... এই কথা বলিবার পর তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। কান্না প্রশমন হওয়ার পর তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করেন–

اياكم و الكذب فانه مع الفجور و هما في النار و عليكم بالصدق فانه مع البر و هما في الجنة

অর্থঃ তোমরা মিথ্যা হইতে বাঁচিয়া থাক। মিথ্যা হইল পাপাচারের সঙ্গী। (মিথ্যা ও পাপাচার) এই উভয়ের স্থান জাহান্নাম। তোমরা সত্যকে আকড়াইয়া ধর। কেননা, সততা হইল নেক আমলের সঙ্গী। (সততা ও নেক আমল) এই উভয়ের স্থান জান্নাত। (ইবনে মাজা, নাসাঈ)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

ان الكذب باب من ابواب النفاق

অর্থাৎ– "মিথ্যা হইল নেফাকের দরজা সমূহের মধ্য হইতে একটি দরজা।" (ইবনে আ'দী)

হযরত সুফিয়ান বিন উসাইদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ একটি বড় খেয়ানত হইল এই যে, তোমার ভাইকে তুমি এমন কোন কথা বলিলে, যেই কথায় সে তোমাকে সত্যবাদী মনে করিতেছে, অথচ তুমি তাহার নিকট মিথ্যা বলিলে। (আবু দাউদ)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ "মানুষ সব সময় মিথ্যা বলে, মিথ্যার সন্ধানে থাকে, অবশেষে আল্লাহ পাকের নিকট তাহাকে মিথ্যাবাদী লেখা হয়।" (বোখারী, মুসলিম)

এক রেওয়ায়েতে মিথ্যার পরিণতির কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে–

اَلْكِذْبُ يَنْقُصُ الرِّزْقَ

"মিথ্যার ফলে রিজিক কমিয়া যায়।"

একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ ব্যবসায়ীগণ পাপাচারী হইয়া থাকে। ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তায়ালা ক্রয়-বিক্রয় হালাল এবং সূদকে হারাম করিয়াছেন। সুতরাং ব্যবসায়ীগণ পাপাচারী হওয়ার কারণ কি? তিনি ফরমাইলেন, উহার কারণ হইল, তাহারা শপথ করিয়া করিয়া গোনাহগার হয় এবং কিছু বলিলে মিথ্যা বলে। (আহমাদ, হাকিম বায়হাকী)

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তিন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলিবেন না এবং তাহাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না। ১. যেই ব্যক্তি কাহাকেও কিছু দান করিয়া খোঁটা দেয়। ২. যেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করিয়া পণ্য বিক্রয় করে। ৩. যেই ব্যক্তি টাখনুর নীচ পর্যন্ত ঝুলাইয়া পাজামা পরিধান করে। (মুসলিম)

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ যেই ব্যক্তি মানুষকে হাসাইবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে, তাহার ধ্বংস অনিবার্য। (আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসাঈ)

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ আমি দেখিতে পাইলাম যেন এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া বলিল, চলুন। আমি তাহার সঙ্গে চলিলাম। কিছুক্ষণ পর দুইজন মানুষ দেখিতে পাইলাম। তাহাদের একজন দাঁড়াইয়া আছে এবং অপরজন তাহার সম্মুখে বসিয়া আছে। দাঁড়ানো লোকটির হাতে একটি লোহার গুর্জ; উহা দ্বারা সে উপবিষ্ট লোকটির এক চোয়াল হইতে চিরিতে চিরিতে কাঁধ পর্যন্ত লইয়া আসিতেছে। অতঃপর দ্বিতীয় চোয়াল চিরিতে শুরু করিলে পূর্বোক্ত চোয়ালটি ভাল হইয়া যাইতেছে। আমি আমার সঙ্গের লোকটিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, এই লোকটি মিথ্যাবাদী। কেয়ামত পর্যন্ত কবরে তাহার উপর এইরূপ শাস্তি হইতে থাকিবে। (বোখারী)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাররাদ (রাঃ) বলেন, একবার আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মোমেন কখনো জিনা করে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, (মোমেনের দ্বারা) কখনো এইরূপ হইয়া যায় বটে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, সে মিথ্যা বলে কি? তিনি বলিলেন, না। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াত তেলাওয়াত করিলেন–

إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

অর্থঃ "মিথ্যা কেবল তাহারা রচনা করে, যাহারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস

করে না।" (সূরা নাহল - ১০৫ আয়াত)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

ثـلاثـة لا يـكـلـمـهـم الله و لا يـنـظـر الـيـهـم و لا يـزكـيـهـم و لـهـم عـذاب الـيـم :

شـيـخ زان و ملك كـذاب و عـائـل مـسـتـكـبر

অর্থঃ আল্লাহ পাক (নিম্নবর্ণিত) তিন প্রকার মানুষের সঙ্গে কথা বলিবেন না। তাহাদের প্রতি (রহমতের নজরে) দেখিবেন না। তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না এবং তাহাদের উপর ভয়ানক আজাব হইবে–

১. বৃদ্ধ ব্যভিচারী।

২. মিথ্যাবাদী বাদশাহ।

৩. বিত্তহীন অহংকারী। (মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমের বর্ণনা করেন, (আমি যখন ছোট ছিলাম তখন) একবার আমার মাতা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার নিকট আস, তোমাকে একটা জিনিস দিব। এই সময় আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহাকে কি দিতে ইচ্ছা করিয়াছ? আমার মাতা বলিলেন, আমি তাহাকে খেজুর দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খবরদার! তুমি যদি তাহাকে কিছুই না দিতে, তবে তোমার নামে মিথ্যা বলার গোনাহ লেখা হইত। (আবু দাউদ)

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ আল্লাহ পাক যদি আমাকে এই কংকরসমূহের সমান নেয়মত দান করেন, তবে সেই সমুদয় নেয়মত আমি তোমাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিব। অতঃপর তোমরা আমাকে কৃপণতা করিতে, মিথ্যা বলিতে কিংবা হৃদয় সংকুচিত করিতে দেখিবে না। (মুসলিম)

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাকিয়ায় হেলান দেওয়া অবস্থায় এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাদিগকে সেই সকল গোনাহের কথা বলিব না, যাহা কবীরা গোনাহের মধ্যেও বড়? অতঃপর বলিলেন, আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা এবং মাতাপিতার নাফরমানী করা। এই পর্যায়ে তিনি সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেনঃ মিথ্যাও কবীরা গোনাহের মধ্যে বড় গোনাহ। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ "মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলে তখন ঐ মিথ্যা ভাষণের দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতা এক মাইল দূরে সরিয়া যায়।" (তিরমিজী)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ তোমরা আমার ছয়টি কথা পালন কর, আমি তোমাদের জন্য বেহেশতের ওয়াদা করিব। সেই ছয়টি বিষয় এই—

১. মিথ্যা কথা বলিও না।

২. ওয়াদা খেলাফ করিও না।

৩. আমানতের খেয়ানত করিও না।

৪. দৃষ্টি অবনমিত রাখিও।

৫. লজ্জাস্থানের হেফাজত করিও এবং

৬. নিজের হাত দ্বারা অপর কাহাকেও কষ্ট দিওনা।

আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ শয়তানের একটি সুরমা, একটি চাটনী এবং একটি সুগন্ধি আছে। তাহার চাটনী হইল মিথ্যা, সুগন্ধি হইল ক্রোধ এবং তাহার সুরমা হইল নিদ্রা। (তাবরানী)

একদিন হযরত ওমর (রাঃ) খোৎবা দেওয়ার সময় বলিলেন, আজ আমি যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন এখানে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে এই নসীহত করিয়াছিলেন—

আমার ছাহাবীগণের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিও। অতঃপর তাহাদের পরবর্তীগণের সঙ্গে। উহার পর মিথ্যা ছড়াইয়া পড়িবে এবং মানুষ বিনা আহবানে আসিয়া হলফ করিবে ও সাক্ষ্য দিবে। (মুসলিম)

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ যেই ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মুসলমানের সম্পদ দখল করার জন্য মিথ্যা শপথ করিবে, সেই ব্যক্তি এমন অবস্থায় আল্লাহ পাকের সঙ্গে মিলিত হইবে যে, আল্লাহ পাক তাহার উপর অসন্তুষ্ট থাকিবেন। (বোখারী, মুসলিম)

বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এমন এক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন, যে একটি কথা মিথ্যা বলিয়াছিল। (ইবনে আবিদ্দুনয়া)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক অপছন্দনীয় অভ্যাস ছিল মিথ্যা বলার অভ্যাস। সুতরাং তিনি যদি কোন ছাহাবী মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা জানিতে পারিতেন, তবে সেই ছাহাবী তওবা করিয়া অন্তর পরিষ্কার করার পূর্ব পর্যন্ত তাহার মনের অস্বস্তি দূর হইত না।

(মুসনাদে আহমাদ)

একবার হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! তোমার বান্দাদের আমলের বিবেচনায় কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ? এরশাদ হইলঃ যেই ব্যক্তির জিহবা মিথ্যা বলে না, অন্তর পাপাচারে লিপ্ত হয় না এবং লজ্জাস্থান ব্যভিচার করে না।

একদা হযরত লোকমান (রহঃ) আপন পুত্রকে নসীহত করিয়া বলিলেন, বৎস! কখনো মিথ্যা কথা বলিও না– যদিও তাহা পাখীর গোশতের মত সুস্বাদু হয়। সামান্য মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করিয়া দেয়।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, চারিটি বিষয় যদি তোমার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তবে দুনিয়ার হাসিল না হওয়া বিষয় সমূহ দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। (সেই চারিটি বিষয় হইল) সত্য কথন, আমানতের হেফাজত, উত্তম স্বভাব ও হালাল লোকমা।

হযরত মোয়াজ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নসীহত করিলেন–

اوصيك بتقوى الله، و صدق الحديث، و اداء الامانة و الوفاء بالعهد و بذل الطعام و خفض الجناح •

অর্থঃ আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করিতে, সত্য বলিতে, আমানত আদায় করিতে, চুক্তি পূরণ করিতে, খানা খাওয়াইতে এবং বিনয় অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেছি। (আবু নোয়াইম)

মহা মনীসীদের বাণী

০ হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আল্লাহ পাকের নিকট সব চাইতে বড় গোনাহ হইল মিথ্যা কথা এবং সব চাইতে নিকৃষ্ট অনুশোচনা হইল কেয়ামত দিবসের অনুশোচনা।

০ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) বলেন, যখন হইতে আমি পাজামা পরিধান করা শুরু করিয়াছি। অর্থাৎ– যখন হইতে আমার আকল-বুদ্ধি

হইয়াছে, তখন হইতে কখনো আমি মিথ্যা কথা বলি নাই।

০ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমার সঙ্গে সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিকেই উত্তম মনে হয়, যার নাম উত্তম। কিন্তু সাক্ষাত হওয়ার পর সেই ব্যক্তিকেই উত্তম মনে হয়, যার স্বভাব ভাল। আর লেনদেন করার পর উত্তম মনে হয় সেই ব্যক্তিকে যে কথায় সাচ্চা এবং ওয়াদায় পাক্কা।

০ মাইমুন বিন আবী শোয়াইব বলেন, একবার আমি একটি চিঠি লিখিতেছিলাম। হঠাৎ একটি শব্দে আসিয়া আমার কলম থামিয়া গেল। শব্দটি এমন যে, উহা লেখা হইলে আমার চিঠির শ্রী বৃদ্ধি হইবে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মিথ্যাও লেখা হইবে। পরে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলাম যে, সেই শব্দটি বর্জন করিয়া এমন একটি শব্দ লিখিব যাহা সত্য। এমন সময় ঘরের এক কোন্ হইতে আওয়াজ আসিল–

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ ۔

অর্থঃ আল্লাহ্ তায়ালা মোমেনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। পার্থিব জীবনে এবং পরকালে।" (সূরা ইব্রাহীম - ২৭ আয়াত)

০ শা'বী বলেন, আমি ইহা বলিতে পারিব না যে, মিথ্যা এবং কৃপণতা– এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে কোন্‌টি মানুষকে দোজখের অধিক অতলে লইয়া যাইবে।

০ ইবনে সাম্মাক বলেন, আমার ধারণায় মিথ্যা না বলার কারণে আমার কোন ছাওয়াব হইবে না। কারণ, আমি তো পার্থিব লজ্জার কারণে মিথ্যা পরিহার করিয়াছি।

০ খালেদ ইবনে সাবীহ এর নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কোন ব্যক্তি মাত্র একটি মিথ্যা বলিলেও কি তাহাকে মিথ্যাবাদী বলা হইবে? তিনি বলিলেন, অবশ্যই।

০ হযরত মালেক ইবনে দীনার বলেন, আমি এক কিতাবে পড়িয়াছি, হাশরের দিন ওয়ায়েজের ওয়াজ তাহার আমলের পাল্লায় রাখা হইবে। তাহার আমল যদি ওয়াজ অনুযায়ী হয়, তবে তো ভাল। অন্যথায় তাহার ঠোঁট আগুনের কেঁচি দ্বারা কর্তন করা হইবে। একটি কাটিয়া অপরটি কাটিতেই প্রথমটি ভাল হইয়া যাইবে। তাহার উপর ক্রমাগত এই আজাব হইতে থাকিবে।

০ একবার হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) ওলীদ বিন আব্দুল মালেককে কোন কথা বলিলেন। ওলীদ বলিলেন, আপনি মিথ্যা বলিতেছেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, আল্লাহর শপথ! যখন হইতে আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি যে, মিথ্যা একটি মন্দ বিষয়, তখন হইতে জীবনে কখনো আমি মিথ্যা বলি নাই।

যেইসব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়েজ

মিথ্যা উহার নিজস্ব অবস্থানে বা সত্ত্বাগতভাবে হারাম নহে; বরং মিথ্যার সর্ব নিম্ন ক্ষতি হইল, মিথ্যা কথা শুনিবার পর উহার শ্রোতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি অবাস্তব ধারণা লাভ করে এবং উহার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার শিকার হয়। অবশ্য অনেক সময় কোন বিষয়ের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত থাকে; এইরূপ ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়েজ। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তো মিথ্যা বলা ওয়াজিব হইয়া যায়।

মাইমুন বিন মেহরান বলেন, অনেক সময় সত্য অপেক্ষা মিথ্যা উত্তম হয়। যেমন, কোন ডাকাত যদি কোন পথিককে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তলোয়ার হাতে তাড়া করে এবং সেই পথিক প্রাণভয়ে তোমার বাড়ীতে আসিয়া আত্মগোপন করিবার পর যদি সেই ডাকাত আসিয়া তোমার নিকট পথিকের সন্ধান জিজ্ঞাসা করে, তবে এই ক্ষেত্রে বিপন্ন পথিকের প্রাণ রক্ষার্থে ডাকাতের সঙ্গে স্পষ্ট মিথ্যা কথা বলা ওয়াজিব। অর্থাৎ ডাকাতকে সাফ বলিয়া দিবে যে, পথিক আমার ঘরে নাই।

মোটকথা, মানুষের মুখের 'কথা' হইল, উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম মাত্র। তো কোন ক্ষেত্রে যদি একটি উৎকৃষ্ট লক্ষ্য মিথ্যা ও সত্য উভয়টি দ্বারা অর্জিত হওয়া সম্ভব হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা হারাম। আর যদি কেবল মিথ্যা দ্বারাই সেই লক্ষ্য অর্জিত হওয়া সম্ভব হয়, তবে এমতাবস্থায় লক্ষ্য বৈধ হইলে মিথ্যা বলা বৈধ এবং লক্ষ্য ওয়াজিব হইলে মিথ্যা বলাও ওয়াজিব। উপরের উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গিয়াছে। মুসলমানের জীবন রক্ষা করা যেহেতু ওয়াজিব, সেহেতু সত্য বলিলে যদি মুসলমানের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে দুইজনের মধ্যে শান্তি স্থাপনে এবং মজলুমের অন্তর হইতে ভয়-ভীতি দূর করার ক্ষেত্রে যদি মিথ্যা বলা ছাড়া কোন উপায় না থাকে, তবে সেই ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা মোবাহ। অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব মিথ্যা বর্জন করিয়া চলার

চেষ্টা করিতে হইবে। অন্যথায় অনাবশ্যক ক্ষেত্রেও মিথ্যা বলার এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলার অভ্যাস হইয়া যাইতে পারে।

হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (নিম্ন বর্ণিত) তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনি নাই। (সেই তিনটি ক্ষেত্র হইল) (১) দুই ব্যক্তির মধ্যে সন্ধি স্থাপনে, (২) যুদ্ধক্ষেত্রে এবং (৩) স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য দূর করার ক্ষেত্রে। (মুসলিম)

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

ليس بكذاب من اصلح بين اثنين فقال خيرا او نمى خيرا

অর্থঃ যেই ব্যক্তি দুইজনের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভাল কথা বলে এবং ভাল বর্ণনা করে, সে মিথ্যাবাদী নহে। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আসমা বিনতে জায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما ·

অর্থাৎ– মানুষের প্রতিটি মিথ্যা লেখা হয়। কিন্তু ঐ ব্যক্তির মিথ্যা লেখা হয় না, যে দুই জন মুসলমানের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে। (আহমাদ, তিরমিজী)

হযরত আবু কাহেল বর্ণনা করেন, একবার দুইজন ছাহাবীর মধ্যে কি কারণে উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা হয়। পরে তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিবার উপক্রম হয়। একদিন তাহাদের এক জনের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হইলে আমি তাহাকে বলিলাম, ভাই! তুমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহিতেছ, অথচ সেই ব্যক্তি তো তোমার প্রশংসা করে। পরে হুবহু এই মন্তব্য আমি তাহার প্রতিপক্ষের নিকটও করিলাম। আমার এই প্রচেষ্টায় তাহাদের বিরোধ নিষ্পত্তি হইয়া তদস্থলে শান্তি স্থাপিত হয়।

কিন্তু পরে আমার মনে এইরূপ চিন্তা আসিল– আমার উপরোক্ত উদ্যোগের ফলে তাহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মিথ্যা বলার কারণে তো আমি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম। পরে এই ঘটনা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলে তিনি এরশাদ করিলেন–

يَا اَبَا كَاهِلٍ اَصْلِحْ بَيْنَ النَّاسِ وَلَوْ بِالْكِذْبِ

– হে আবু কাহেল! পরস্পরের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর, যদিও তাহা মিথ্যা বলিয়া হয়। (তাবরানী)

এক ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার স্ত্রীর সঙ্গে মিথ্যা বলিব? জবাবে তিনি এরশাদ করিলেনঃ মিথ্যার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি তাহার সঙ্গে ওয়াদা করিব? তিনি বলিলেনঃ ইহাতে কোন দোষ নাই।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলের ঘটনা। আবু উরওয়া নামে এক ব্যক্তি ঘন ঘন বিবাহ করিত এবং কিছু দিন পরই স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া লইত। তাহার এই বদ অভ্যাসের কথা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িলে মানুষের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে এই ঘটনা হযরত ওমর (রাঃ)-এর গোচরীভূত হইলে তিনি আবু উরওয়ার উপর ক্ষুব্ধ হন। আবু উরওয়া যখন টের পাইল যে, আমীরুল মোমেনীন তাহার সম্পর্কে জানিতে পারিয়াছেন তখন সে বেশ শঙ্কিত হইয়া পড়িল। পরে সে একদিন আব্দুল্লাহ বিন আরকামকে নিজের ঘরে লইয়া আসিল এবং তাহাকে সাক্ষী রাখিয়া নিজের স্ত্রীকে প্রশ্ন করিল, তোমাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি আমাকে খারাপ মনে কর কিনা। সে বলিল, কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিও না। স্বামী বলিল– না, তোমাকে কসম দিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্য করিয়া বল, "তুমি আমাকে দেখিতে পার না" এই কথা সঠিক কিনা। স্ত্রী জবাব দিল হাঁ! প্রকৃত পক্ষেই আমি অন্তর দিয়া তোমাকে ঘৃণা করি। এইবার আবু উরওয়া আব্দুল্লাহ বিন আরকামকে বলিল, আপনি শুনিতে পাইলেন তো? অতঃপর সে ইবনে আরকামকে সঙ্গে লইয়া হযরত ওমর (রাঃ)-এর দরবারে গিয়া আরজ করিল, হে আমীরুল মোমেনীন! আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিয়াছে যে, আমি আমার স্ত্রীদের উপর জুলুম করি এবং তাহাদিগকে তালাক দিয়া দেই। এই বিষয়ে আমি আব্দুল্লাহ বিন আরকামকে সাক্ষী লইয়া আসিয়াছি, আপনি তাহার নিকট হইতে প্রকৃত ঘটনা শুনুন।

হযরত ওমর (রাঃ) ইবনে আরকামের নিকট বিস্তারিত ঘটনা শুনিবার পর আবু উরওয়ার স্ত্রীকে তলব করিলেন। আবু উরওয়ার স্ত্রী তাহার ফুফুকে সঙ্গে লইয়া আমীরুল মোমেনীনের দরবারে হাজির হইল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তোমার স্বামীকে এইরূপ বলিয়াছ যে,

আমি তোমাকে ঘৃণা করি। মহিলা আরজ করিল, হে আমীরুল মোমেনীন! আমি আল্লাহ্ পাকের নিকট তওবা করিয়া আমার বক্তব্য প্রত্যাহার করিতেছি। আমার স্বামী আমাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই কারণে আমি মিথ্যা বলিতে পারি নাই। আপনি বলুন, এখন হইতে কি আমি এই বিষয়ে মিথ্যা বলিব? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ! এই বিষয়ে তুমি মিথ্যা বলিবে। স্ত্রীর নিকট স্বামী পছন্দ না হইলেও ইহা কখনো স্বামীর নিকট প্রকাশ করিতে নাই। কেননা, স্বামী-স্ত্রীর সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের উপরই পরিবারের সুখ নির্ভর করে।

নাওয়াস ইবনে সামআন হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ তোমাদের কি হইল যে, আমি তোমাদিগকে মিথ্যার উপর এমনভাবে পতিত হইতে দেখিতেছি, যেমন আগুনের উপর পতঙ্গ পতিত হয়? ইবনে আদমের প্রতিটি মিথ্যা নিশ্চিতভাবেই লিপিবদ্ধ করা হইবে; কেবল ইহা ব্যতীত যে, কোন ব্যক্তি যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে মিথ্যা বলে। কেননা, যুদ্ধ হইল প্রতারণা। কিংবা দুই জনের মধ্যে যদি শত্রুতা থাকে, আর সে মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাদের মধ্যে সন্ধি করাইয়া দেয়, অথবা নিজের স্ত্রীকে খুশী করার জন্য যদি মিথ্যা বলে।

হযরত ছাওবান বলেন, প্রতিটি মিথ্যাই গোনাহ। তবে ঐ মিথ্যার মধ্যে যদি কোন মুসলমানের উপকার ও কল্যাণ নিহিত থাকে কিংবা ঐ মিথ্যা দ্বারা যদি কোন মুসলমানের কষ্ট দূর হয়, তবে উহা গোনাহ নহে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, কোন মিথ্যা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সংশ্লিষ্ট করা– ইহা অপেক্ষা আমি উত্তম মনে করি যে, আমাকে আসমান হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হউক। অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে যদি কেহ মিথ্যা বলে তবে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কেননা, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতারণা হইয়াই থাকে।

মোটকথা, মিথ্যা বলার ব্যাপারে উপরোক্ত তিনটি স্থানের ব্যতিক্রম হাদীস দ্বারা জানা গেল। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রেও যদি এমন হয়, যেখানে বিশুদ্ধ লক্ষ্য সামনে রাখিয়া মিথ্যা বলা হয়, তবে উহাও জায়েজের মধ্যে গণ্য হইবে। যেমন কোন ডাকাত বা জালেম পাকড়াও করিয়া যদি জিজ্ঞাসা করে, বল, তোমার ধন-সম্পদ কোথায় আছে? তবে জবাবে "আমার ধন-সম্পদ নাই" বলা জায়েয আছে। অনুরূপভাবে কোন ক্ষমতাধর শাসক পাকড়াও করিয়া যদি বলে, তুমি গোপনে কি কি অপরাধ করিয়াছ বল, তবে এই ক্ষেত্রেও মিথ্যা কথা

বলিয়া নিজের অপরাধ গোপন করা জায়েয। কেননা, মন্দ বিষয় প্রকাশ করাও মন্দ। মোটকথা, নিজের জান, মাল ও ইজ্জতের হেফাজতের উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা জায়েয।

অপরের জন্য মিথ্যা বলার উদাহরণ হইল– কোন ব্যক্তি যদি অপর কাহারো কোন গোপন বিষয় জানিতে চাহে, তবে এমন বলিয়া দেওয়া যে, "আমি জানি না"। কিংবা মিথ্যার মাধ্যমে বিবদমান দুই ব্যক্তির মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাইয়া দেওয়া, অথবা নিজের স্ত্রীগণের কোন একজনের নিকট অন্তহীন মোহাব্বত ও ভালবাসা প্রকাশ করা– চাই অন্তরের মোহাব্বত অন্য কোন বিবির সঙ্গেই হউক। অনুরূপভাবে স্ত্রীকে খুশী করার উদ্দেশ্যে তাহার সঙ্গে এমন কোন ওয়াদা করা যাহা পূরণ করা নিজের ক্ষমতা বহির্ভূত– ইহাও জায়েজ।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও যেহেতু মিথ্যা একটি মন্দ বিষয়, সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে সত্য কথা বলিলে যদি কোন ক্ষতির শিকার হইতে হয়, তবে এই দুইটি ক্ষতির মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে, যদি মিথ্যার ক্ষতি বেশী হয়, তবে সত্য বলা ওয়াজিব। আর সত্য বলিলে যদি ক্ষতির আশংকা অধিক হয়, তবে মিথ্যা বলা যাইবে। অনেক সময় এই দুইটি বিষয় এমনই বরাবর হয় যে, এই ক্ষেত্রে কোন একটি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া যায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে সত্য বলা উত্তম। কারণ, মিথ্যা বলা কেবল বিশেষ জরুরতের ক্ষেত্রেই মোবাহ করা হইয়াছে। সুতরাং কোন ক্ষেত্রে যদি এই জরুরতটি "বিশেষ জরুরত' কি না, এই বিষয়েই সন্দেহ দেখা দেয়, তবে মিথ্যা বলা যাইবে না।

আসলে উপরোক্ত ক্ষেত্রটি এমনই নাজুক ও সূক্ষ্ম যে, এইরূপ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং এইরূপ পরিস্থিতিতে যথাসম্ভব মিথ্যা হইতে বাঁচিয়া থাকাই উত্তম। বরং নিজের একান্ত জরুরতের ক্ষেত্রেও মিথ্যা পরিহার করিয়া চলা নিরাপদ। অথচ সাধারণভাবে দেখা যায়, মানুষ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অবলীলায় মিথ্যা কথা বলিতেছে। ব্যবসার অতিরিক্ত মোনাফা, ক্ষমতা, নেতৃত্ব ও সম্মানের মোহ ইত্যাদি প্রশ্নে মানুষ মিথ্যা বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেছে না। অথচ এই অবস্থাগুলি এমন যে, এইসব ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সফল না হইলেও মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এমনকি অনেক স্ত্রীলোক নিছক সতিনকে জ্বালাতন করার উদ্দেশ্যে এইরূপ মিথ্যা বলে যে, স্বামী আমাকে এমন এমন অলংকার আনিয়া দিয়াছে, অমুক দামী জোড়া আনিয়া দিয়াছে ইত্যাদি। এইরূপ মিথ্যা বলা সম্পূর্ণ হারাম।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছেঃ যেই ব্যক্তি নিজের এমন আহারের কথা

প্রকাশ করে যাহা সে খায় নাই এবং এইরূপ বলে যে, আমার নিকট এমন বস্তু আছে: অথচ তাহার নিকট উহা নাই কিংবা এইরূপ বলে যে, আমি অমুক বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছি, অথচ সেই বস্তু সে পায় নাই– তবে কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি প্রতারণার কাপড় পরিধানকারীর মত হইবে।

সারকথা হইল, কোন্ ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়েয এবং কোন্ পরিস্থিতিতে সত্য অপেক্ষা মিথ্যা বলা উত্তম তাহা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন ও বিপদজনক। অনেক সময় মানুষের সীমিত বিচার-বুদ্ধি এই ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। এই কারণেই মিথ্যা পরিহার করিয়া সত্য বলা নিরাপদ। অবশ্য কোন ক্ষেত্রে যদি মিথ্যা বলা ওয়াজিব হইয়া পড়ে, তবে তাহা ভিন্ন কথা। যেমন মিথ্যা বলা ব্যতীত যদি প্রাণ রক্ষার দ্বিতীয় কোন উপায় না থাকে এবং অন্যায়ভাবে প্রাণ হারাইবার আশংকা হয় তবে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই মিথ্যা বলিতে হইবে।

উৎসাহ প্রদানের জন্য হাদীস বানাইয়া বলা ঠিক নহে

এক শ্রেণীর মানুষের ধারণা, আমলের ফজিলত এবং গোনাহের নিন্দা অধিক হারে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে হাদীস বানাইয়া বলাতে কোন দোষ নাই। তাহারা মনে করে, উদ্দেশ্য যেহেতু সৎ সুতরাং এই ক্ষেত্রে এইরূপ করার অনুমতি আছে। আসলে এই ধারণা সঠিক নহে।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ– "যেই ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার উপর মিথ্যা আরোপ করিবে, তাহার ঠিকানা হইবে জাহান্নাম।"

উপরোক্ত হাদীসের উপর আমল না করার দৃশ্যত কোন কারণ আমাদের বোধগম্য নহে। মানুষকে গোনাহ হইতে বাঁচাইয়া রাখা এবং আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য হাদীস বানাইয়া বলার কোন প্রয়োজন নাই। এতদ্উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআনের অসংখ্য আয়াত ও হাদীস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি কারণে হাদীস বানাইয়া বলিতে হইবে? অনেকে বলিয়া থাকে, এই প্রসঙ্গে ছহী হাদীসের বিবরণসমূহ এত অধিক বার বর্ণিত হইয়াছে যে, এখন আর উহা মানুষের মধ্যে ক্রিয়া করে না। মানুষের এছলাহ ও সংশোধনের জন্য এখন নূতন নূতন

আলোচনার অবতারণা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই ধারণা একেবারেই অমূলক ও ভ্রান্তিপূর্ণ। আল্লাহ পাক ও তদীয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মনগড়া কথা বানাইয়া বলা অপেক্ষা কঠিন অপরাধ আর কি হইতে পারে? অপরকে গোনাহ হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে নিজে গোনাহে লিপ্ত হওয়া ইহা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত ও শরীয়তসম্মত নহে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে যাবতীয় গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার তাওফীক দান করুন।

ইঙ্গিতেও মিথ্যা বলা ঠিক নহে

আমাদের আকাবেরে দ্বীন বলিয়াছেন, ইঙ্গিতে মিথ্যা বলিলে তাহা মিথ্যার মধ্যে গণ্য হইবে না। আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি ইঙ্গিতে মিথ্যা বলে তবে সে মিথ্যা হইতে বাঁচিয়া যাইবে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) সহ আরো কতক ব্যক্তিবর্গ হইতেও এই জাতীয় অভিমত বর্ণিত আছে। তাঁহাদের বক্তব্যের মর্ম হইল- যদি কেহ মিথ্যা বলিতে বাধ্য হয়, তবে সে যেন ইঙ্গিতে বলিয়া দেয়। অন্যথায় বিনা বাধ্যবাধকতায় মিথ্যা প্রকাশ্যেও জায়েজ নহে এবং ইঙ্গিতেও নহে। ইঙ্গিতে মিথ্যা বলার অর্থ হইতেছে- এমন দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা যে, উহাতে বক্তার উদ্দেশ্য থাকে এক রকম কিন্তু শ্রোতা উহার ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে। উহার উদাহরণ এইরূপ-

একবার মুতরিফ জায়েদের নিকট গেলে জায়েদ তাহাকে বলিল, তুমি এতদিন পরে আসিলে? জবাবে মুতরিফ নিজের কোন অসুস্থতার বাহানা করিয়া বলিল, আপনার নিকট হইতে যাওয়ার পর আমি একবারও পার্শ্বপরিবর্তন করি নাই; তবে আল্লাহর ইচ্ছায় যদি তাহা করিয়া থাকি।

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রহঃ) বলেন, কোন মানুষ যদি তোমার বরাত দিয়া কোন মিথ্যা কথা বর্ণনা করে, আর তুমি যদি তাহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিতে না চাও, তবে এইরূপ বলিয়া দিবে যে, "এই বিষয়ে আমি কি বলিয়াছি তাহা আল্লাহ পাক জানেন।"

হযরত মোআজ বিন জাবাল (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে এক প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন। একবার তিনি বাড়ী আসিলে তাহার স্ত্রী বলিলেন, সব গভর্ণররা তো বাড়ী আসার সময় পরিবারের লোকদের জন্য কিছু লইয়া আসে। আপনি আমাদের জন্য কিছু আনিয়াছেন কি? জবাবে তিনি বলিলেন- না। আমার সঙ্গে একজন পর্যবেক্ষক নিযুক্ত ছিল। এই বক্তব্যে হযরত

মোআজের উদ্দেশ্য ছিল- "আল্লাহ আমার পর্যবেক্ষক। আর তাহার স্ত্রী বুঝিলেন- সম্ভবতঃ হযরত ওমর (রাঃ) তাহার পিছনে কোন গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আপনি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিশ্বস্ত ছিলেন, হযরত আবু বকরের শাসনামলেও বিশ্বস্ত ছিলেন, তাঁহারা কখনো আপনার পিছনে গুপ্তচর নিযুক্ত করেন নাই; অথচ হযরত ওমর (রাঃ) আপনার পিছনে গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন।

পরে এই ঘটনাটি মানুষের মুখে মুখে চর্চা হইতে হইতে এক পর্যায়ে হযরত ওমরের কানে গেল। তিনি হযরত মোআজ (রাঃ)-কে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কোন্ ব্যক্তিকে তোমার পিছনে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলাম? জবাবে তিনি বলিলেন, আমি তো এই কথা বলি নাই যে, "আপনি আমার পিছনে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছেন।" অতঃপর তিনি আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আমার বক্তব্যের অর্থ ছিল- আল্লাহ পাক আমার সকল কিছু দেখিতেছেন এবং আমার কোন আমলই তাঁহার পর্যবেক্ষণের বাহিরে নহে। এই কথা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) হাসিলেন এবং তাহাকে কিছু অর্থ কড়ি দিয়া বলিলেন, যাও ইহা লইয়া গিয়া তোমার স্ত্রীকে খুশী কর।

হযরত নাখয়ী (রহঃ) নিজের মেয়েকে কখনো এইরূপ বলিতেন না যে, "তোমাকে মিষ্টি আনিয়া দিব"; বরং মেয়েকে তিনি বলিতেন, "তোমাকে যদি মিষ্টি আনিয়া দেই"? কেননা, অনেক সময় তাহার পক্ষে মিষ্টি ক্রয় করা সম্ভব হইত না।

অনুরূপভাবে বাড়ীর ফটকে আসিয়া কেহ আওয়াজ দিলে যদি নিজে হাজির হইতে না চাহিতেন তবে খাদেমকে বলিয়া দিতেন, গিয়া বল যেন আমাকে মসজিদে তালাশ করে। এইরূপ বলিও না যে, আমি ঘরে নাই। তাহা হইলে মিথ্যা বলা হইবে।

হযরত শা'বী (রহঃ) এই ক্ষেত্রে একটি বৃত্ত আঁকিয়া খাদেমকে বলিতেন, ইহার ভিতর হাত রাখিয়া সাক্ষাতপ্রার্থীকে বলিয়া দিও যে, তিনি এখানে নাই।

মোটকথা, জরুরতের সময় ইশারা-ইঙ্গিতে মিথ্যা কথা বলা মোবাহ। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে এইরূপ বলা উচিৎ নহে। কেননা, উহার ফলে শ্রোতা একটি অবাস্তব বিষয়ের ধারণা পায়; আর শাব্দিক অর্থে উহা মিথ্যা না হইলেও মাকরূহ বটে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওৎবা বর্ণনা করেন, একবার আমি আমার পিতার সঙ্গে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের খেদমতে গেলাম। তখন আমার পরনে উৎকৃষ্ট পোশাক ছিল। পরে তাহার দরবার হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় লোকেরা আমার উত্তম পোশাক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই পোশাকটি কি আমীরুল মোমেনীন দিয়াছেন? এই প্রশ্নের জবাবে আমি কেবল বলিলাম, "আমীরুল মোমেনীনকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন।" আমার পিতা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন, বেটা! মিথ্যা হইতে বাঁচিয়া থাক। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওৎবার এই বাক্যটি মিথ্যা ছিল না, ইহা ছিল একটি দোয়া মাত্র। তবে মানুষ সাধারণতঃ শাসকদের নিকট হইতে কিছু পাওয়ার পরই তাহাদের জন্য দোয়া করিয়া থাকে বিধায় লোকেরা তাহার এই উক্তি হইতে মনে করিল, পোশাকটি তাহাকে আমীরুল মোমেনীনই দিয়াছেন। অথচ বাস্তব অবস্থা এইরূপ ছিল না। অর্থাৎ এইরূপ পরিস্থিতিতে মানুষের ধারণার প্রতি সমর্থনসূচক কোন মন্তব্য করা নিছক নিজের অহংকার প্রদর্শন ও সুখ্যাতি প্রকাশের জন্যই হইয়া থাকে।

অবশ্য অতি মামুলী বিষয়ে ইঙ্গিতে মিথ্যা বলা মোবাহ। যেমন, কাহারো মনে আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহার সঙ্গে মজাক করা ইত্যাদি। উদাহরণতঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৃদ্ধাকে বলিয়াছিলেনঃ কোন বৃদ্ধা নারী জান্নাতে যাইবে না। অন্য এক মহিলাকে বলিয়াছিলেনঃ তোমার স্বামীর চোখে ধবল আছে। অনুরূপভাবে অপর এক রমণীকে বলিয়াছিলেনঃ সওয়ারীর জন্য আমি তোমাকে একটি উটের বাচ্চা দিতে পারি। এইসব ঘটনা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে।

এই হাসি-মজাকের ক্ষেত্রে স্পষ্ট মিথ্যার উদারহণ হইল- যেমন কোন পাগলকে বলা হইল, অমুক সুন্দরী নারী তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে ইত্যাদি। অবশ্য এই কথা সত্য যে, এই ধরনের আনন্দ-কৌতুকের ক্ষেত্রে যদি অপরকে কষ্ট দেওয়ার নিয়ত না হইয়া কেবল কৌতুক করাই উদ্দেশ্য হয়, তবে কৌতুককারীকে মিথ্যুক বলা যাইবে না বটে। কিন্তু তাহার ঈমানের স্তর কিছু না কিছু অবশ্যই হ্রাস পাইবে।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ মানুষের ঈমান ততক্ষন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ হয় না, যতক্ষণ না সে নিজের ভাইয়ের জন্য এমন বিষয় পছন্দ করিবে যাহা নিজের জন্য পছন্দ করে এবং যতক্ষণ না হাসি মজাকে মিথ্যা পরিহার করিবে।

আরেক প্রকার মিথ্যাও এমন আছে, যাহা দ্বারা মানুষ ফাসেক হয় না। যেমন, কেহ বলিল– আমি তোমাকে একশ বার ডাকিলাম, অথচ তুমি কোন জবাব দিলে না। কিংবা কেহ বলিল– হাজার বার নিষেধ করিবার পরও তুমি শুনিলে না। অর্থাৎ এখানে যদিও আহ্বানকারী একশতবার আহ্বান করে নাই এবং নিষেধকারীও হাজার বার নিষেধ করে নাই: তথাপি তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা যাইবে না। অর্থাৎ এখানে বর্ণিত সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য হয় না, বরং অতিরঞ্জন সহকারে আধিক্য বোঝানোই উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি কেবল একবার ডাকিয়া বা একবার নিষেধ করিয়াই উপরোক্ত মন্তব্য করে, তবে তাহার সেই মন্তব্য মিথ্যা হইবে। কয়েকবার বলিয়া থাকিলে মিথ্যা হইবে না– যদিও উহার সংখ্যা একশত বা হাজারে পৌঁছিয়া না থাকে। অবশ্য এইরূপ অতিরঞ্জন করিয়া কথা বলাও নিরাপদ নহে। কেননা, অনেক সময় এমন হয় মানুষ অতিরঞ্জনের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া মিথ্যার মধ্যে জড়াইয়া পড়ে।

আরেক প্রকার মিথ্যা এমন যাহা মানুষ অভ্যাসবশতঃ বলিয়া থাকে এবং ইহাকে কোন মিথ্যার মধ্যে গণ্য করে না। যেমন খানা খাইতে আহবান করিবার পর পেটে ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও সাফ বলিয়া দিল যে, আমার ক্ষুধা নাই। এই উক্তির পিছনে যদি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সুপ্ত না থাকে, তবে এইরূপ বলা নিষেধ ও হারাম।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) হযরত আসমা বিনতে ওমায়েস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে যখন বাসর রাতের জন্য সাজানো হয়, তখন আমি তাহার সঙ্গে ছিলাম। আমরা কয়েকজন মহিলা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে লইয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। আল্লাহর কসম! তখন পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে মেহমানদের সামনে পেশ করার মত এক পেয়ালা দুধ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তিনি নিজে সেই পেয়ালা হইতে দুধ পান করিয়া অবশিষ্ট দুধসহ পেয়ালাটি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর দিকে বাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) লজ্জার কারণে তাহা ধরিতে পারিতেছিলেন না। আমি বলিলাম, আল্লাহর নবীর হাত ফিরাইয়া দিও না এবং পেয়ালাটি ধর। হযরত আয়েশা (রাঃ) লজ্জায় এতটুকু হইয়া পেয়ালাটি ধরিলেন এবং উহা হইতে কিছু দুধ পান করিলেন। এই সময় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অবশিষ্ট দুধ তোমার সঙ্গিনীদেরকে দিয়া দাও। আমরা আরজ করিলাম, আমাদের ক্ষুধা নাই। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,

ক্ষুধা ও মিথ্যা একত্র করিও না। আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও যদি বলিয়া দেই যে, ক্ষুধা নাই, তবে কি তাহা মিথ্যার মধ্যে গণ্য হইবে? জবাবে তিনি এরশাদ করিলেনঃ মিথ্যা মিথ্যাই লেখা হয়।

হযরত লাইস ইবনে সা'দ বলেন, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের চোখে সব সময় কেতুর লাগিয়া থাকিত। লোকেরা ইহা দেখিয়া বলিত, আপনি হাত দ্বারা চোখের ময়লা পরিষ্কার করিয়া নিন। জবাবে তিনি বলিতেন, আমি কেমন করিয়া চোখ পরিষ্কার করিব? ডাক্তার আমাকে চোখে হাত লাগাইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং আমি এই নিষেধাজ্ঞা পালন করিব বলিয়া তাহার সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছি। সুতরাং এখন আমি সেই ওয়াদার খেলাফ করিতে পারিব না।

আল্লাহওয়ালাগণ এইভাবেই নিজেদের জবানের হেফাজত করিয়া থাকেন। যেই ব্যক্তি নিজের জিহ্বার হেফাজতে ত্রুটি করিবে, সেই ব্যক্তির জিহ্বা তাহার নিয়ন্ত্রণ হইতে বাহির হইয়া যাইবে। অতঃপর তাহার মুখ হইতে অনর্গল কেমন করিয়া যে মিথ্যা বাহির হইতে থাকিবে তাহা সে নিজেও অনুভব করিতে পারিবে না।

খাওয়াত তাইমী বর্ণনা করেন, একবার রবী' ইবনে খাইসামের বোন তাহার অসুস্থ ছেলেকে দেখিতে আসিল। বালকের শয্যার নিকট গিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, বেটা! এখন তুমি কেমন আছ? রবী' এই সময় বিছানায় শুইয়া ছিলেন। বোনের কথা শুনিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, তুমি কি এই ছেলেটিকে কখনো দুধ পান করাইয়াছ? বোন জবাব দিল– না। তিনি বলিলেন, তবে সে কেমন করিয়া তোমার বেটা হইল? তুমি বরং তাহাকে ভাতিজা বলিতে পার।

এখন আমি এই প্রসঙ্গটি শেষ করিতেছি। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর যথাযথভাবে আমল করার তওফীক দান করুন। আমীন!

।। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে সমাপ্ত ।।